সম্পাদক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[মূল্য পাঁচ সিকা।

গ্রন্থ-সূচী

একবর্ণ চিত্র

ব্যঙ্গ-চিত্র

Printed by—Bijoy Krishna Dass at the
LAKSHMIBILAS PRESS
14, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

বর্ষস্মৃতি

বছরের পর বছর কাটিয়া যায় কেহ তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না, কিন্তু কে না চায় তার স্মৃতিকে বন্দী করিয়া রাখিতে—তার সুখের স্মৃতি, দুঃখের স্মৃতি, আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিতে?

নিরুপমার কর্ত্তৃপক্ষ সমগ্র দেশ সুরভিতে ভরিয়া দিয়াছেন। তাঁরা তাঁদের বর্ষের সুরভি-স্মৃতি বাণীর অঙ্গনে কুসুম চয়ন করিয়া স্থায়ী করিয়া রাখিতে আয়োজন করিয়াছেন। কয়েক বছর ধরিয়াই তাঁহাদের এ অনুষ্ঠান চলিতেছে। প্রতি বর্ষে তাঁরা পূজার জোগাড় করিয়াছেন সাহিত্যের মন্দিরে তাঁরা মণি-দীপমালা জ্বালিবার জন্য খনির অন্ধকার হইতে মণি কুড়াইয়া তাহারা তাঁদের মালা গড়িয়াছেন। এবার তাঁদের আয়োজন একটু স্বতন্ত্র রকমের। এবার যাঁদের লেখার মালায় 'নিরুপমা'-বর্ষকে অমর করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁরা অন্ধকারের লুকান আলো নন, অনেকেই কৃতী সাহিত্যিক, সরস্বতীর পূজারীর দলে চেনা জানা লোক।

"নিরুপমা" শুধু সাহিত্যের রম্য কাননে স্মৃতিমাল্যের উপাদান আহরণ করেন নাই, কলার দুয়ারেও হাত বাড়াইয়াছেন। এমন সুন্দর চিত্রবহুল বই বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ল্লভ। নিরুপমা নামমাত্র মূল্যে পাঠকের হাতে যে সৎসাহিত্য ও মনোজ্ঞ চিত্র তুলিয়া দিতেছেন বাঙ্গলায় বোধহয় তার উপমা নাই।

নিরুপমার সুরভিতে আমোদিত হইয়া এই বর্ষস্মৃতি ঘরে ঘরে আনন্দ সঞ্চারিত করুক, ইহার পাতায় পাতায় যে রূপ ও রস ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা সবার প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করুক। পাঠকের চিত্তে এই বর্ষস্মৃতি সুখের স্মৃতি হইয়া চিরমুদ্রিত থাকুক এই শুভাকাঙ্ক্ষার সহিত আমি ইহাকে সাহিত্যের দরবারে ভর্ত্তি করিয়া দিবার স্পর্দ্ধা করিতেছি। ইতি—

ঢাকা
১লা আশ্বিন ১৩৩০

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বি-বর্ণ চিত্র

নিবেদন

আমাদের বড় আদরের বর্ষস্মৃতি প্রকাশিত হইল। জানি না ইহা সর্ব্বসাধারণের রুচি সঙ্গত হইবে কি না তবে তদুদ্দেশ্যে আমরা সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি

বাসন্তী-পরিচালক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যত্ন, উদ্যম ও আনুকূল্য ব্যতীত ইহা প্রকাশে সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। প্রচ্ছদপটের চিত্র-বৈভবের জন্য কলাধিষ্ঠাত্রীর বর-পুত্র, গরিমাময় বর্ণ-শিল্পী, প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ—এইটী মনোজ্ঞ করিবার জন্য একরাত্রের মধ্যে তিনি এই চিত্রটী অঙ্কণ করিয়া দিয়াছেন—ইহা যে অসামান্য প্রীতির প্রকাশ ও শিল্পীর অদ্ভুত অঙ্কণ-প্রতিভার বিকাশ তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা প্রমুখ বাংলার অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীগণ ইহার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনার্থ চিত্রাঙ্কণ করিয়া আমাদের সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, নতুবা চিত্র-বৈভবে বর্ষস্মৃতি এত পুষ্ট, এত উজ্জ্বল হইত কিনা সন্দেহ।

উদীয়মান রেখাশিল্পী শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ বসুর Crow quill এর বিশ্রাম ছিল না - ব্যঙ্গচিত্রে শ্রীমান সিদ্ধ হস্ত হইয়াছেন—ভগবান তাঁর আঁকনীতে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার চিত্র শিল্পের প্রভূত প্রসার হইয়াছে ; সে কেবল তরুণ শিল্পীগণের প্রাণপণ প্রয়াসে। বাঙালী পাঠক ও আজ তাহার মর্য্যাদা গ্রহণে পরাঙ্মুখ নহেন - ইহাও বড় কম আনন্দের কথা নহে। এই উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী আমরা ব্যবসায়ীশ্রেণী, যদি এই দুইএর সমন্বয় না করি, তবে সে ভার অন্য কে গ্রহণ করিবে ? বিলাতে স্বলন্ডে চিত্র ও সাহিত্য প্রচার করে প্রবিখ্যাত সাবান-ব্যবসায়ী পিয়ার্স কোম্পানী প্রভৃত অর্থব্যয় করেন আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, মহতের পদাঙ্ক অনুসরণে উদ্বাহু বামনের মত এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি - বাঙালী ভাই ভগিনীর সহানুভূতিতে আজ সাতবৎসর কাল এই ব্রত পালনে সমর্থ হইয়াছি ও ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর পুস্তক প্রকাশ করিতেছি।

বিগত ছয় বৎসর আমাদের "নিরুপমা-পুরস্কার" মাত্র এক টাকা মূল্যের নিরুপমা তৈলের ক্রেতাগণকে বিনামূল্যে দিয়া আসিতেছিলাম, এবার চিত্রপ্রাচুর্য্য হেতু গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য পড়তা হিসাবে মাত্র এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইল। এরূপ চিত্রবহুল রচনা সম্পদে পুষ্ট কোন গ্রন্থই এযাবৎ এত অল্পমূল্যে বিক্রীত হয় নাই—এতদ্ভিন্ন ইহা আমাদের প্রচারিত "হিমানী স্নো", "নিরুপমা" তৈল, ভেলভেট ফেস-ক্রীম ও কুম্‌কুম্‌ নামধেয় সুগন্ধির সহিত প্রদত্ত (২৫খানি) কুপনের পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছি। গভীর দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সদাশয় ক্রেতাগণ এই বিনামূল্যে গ্রন্থ পাইবার ব্যবস্থায় লাভবান্ হইতে পারে নাই, কারণ প্রাপ্ত কুপন দৃষ্টে আমরা নিঃসংশয়ে অবগত হইয়াছি যে, অধিকাংশ দ্রব্য হইতে কুপন বাহির করিয়া লইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়াছে ভবিষ্যতের জন্য গ্রাহকগণ

সাবধান হইবেন। ১লা নভেম্বর হইতে ভেলভেট-ক্রীম, ও কুন্‌কুন্ (১আং ষ্টাওার্ড) এর সঙ্গে কুপন আছে কিনা দেখিয়া লইবেন। নিরুপমার প্যাকে কুপন থাকে, উহা বাহির করিয়া লইলে বাক্স বিকৃত হইয়া যায় বলিয়া উহা হইতে কুপন বাহির করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। হিমানীর বাক্সের ডালার উপরস্থ অংশ কাটিয়া লইলে তাহাই কুপনের মত কার্য্যকরী হইবে, উহাতে আর স্বতন্ত্র কুপন থাকিবে না। এই কয় প্রকার মিলাইয়া ইং ১লা নভেম্বর হইতে ইং ১৯২৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মাত্র পঁচিশখানি কুপন সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে আগামী বর্ষে ৺পূজার সপ্তাহ পূর্ব্বে নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি (অষ্টমবর্ষ) প্রেরিত হইবে। রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন, কারণ প্রত্যেককে প্রাপ্তি সংবাদ দেওয়া বা এসম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লিখন সম্ভব হইবে না।

এ বৎসরে নব-যুগের প্রতিষ্ঠালব্ধ সাহিত্যিকগণ যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বাসন্তী-সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কয়লার খনি হাতড়াইয়া যিনি নূতন ধরণের ছোট গল্প বাহির করিয়াছেন সেই শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়, উপাসনার সহকারী-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ভাব-প্রবণ কবি শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ, শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়গণ স্বীয় রচনাদানে আমাদের এই উদ্যমকে কৃতকার্য্য করিতে যে অনন্যসাধারণ ঔদার্য্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দান ব্যতীত সে ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় নাই।

স্নেহপরবশ হইয়া মনস্তত্ত্ববিদ ঔপন্যাসিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, ডি, এল, মহোদয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রয়াসকে তাঁহার যশোগরিমাদীপ্ত গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিয়া আমাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহার ঋণ শোধ করিবার সামর্থ্য তো নাই-ই—সে আশাও যেন বিড়ম্বনা বোধহয়।

৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
১লা আশ্বিন সন ১৩৩০

নিবেদক—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

কুমার-বাহাদুর

(ক)

নবীগঞ্জের নায়েব হলধর হালদার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বর্ষার মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় একটা গুরুগুরু ধ্বনি, গুমরি গুমরি তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতাকে সজীব রাখিয়াছিল নতুবা সেই বিশাল প্রাচীন উলখড়ের টুপীপরা গৃহখানির মধ্যে মানবের অস্তিত্ব অবগত হইবার অন্য উপায় ছিল না।

নায়েব মহাশয় পরম বৈষ্ণব, তাঁহার নাসাগ্র, ললাট, বক্ষস্থল প্রভৃতি হরিদ্রা মৃত্তিকা-চর্চ্চিত, শিরোদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্কুশ স্বরূপ শিখা বর্তমান, গলদেশে তুলসীর মালা বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার তনুখানিকে জগতের বাহ্য চক্ষে পরম পবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান করিত; তবে দুষ্টলোকে বলিত অন্তরটা তাঁহার নাকি শাক্তভাবে পূর্ণ, অর্থাৎ নবীন প্রজার শোণিতপানে তাঁহার অন্তরাত্মা কখন বিমুখ হইতেন না—এটা অবশ্য তাঁহার সামনে কেহ বলিত না। আর হালদার মহাশয় বলিতেন বৈষ্ণব ধর্ম্মে "বাস্তব" রক্ত দর্শন নিষেধ—আধ্যাত্মিক রক্তপানে কোনও দোষ হয় না—"ওসব ছোটলোক বেটাদের বজ্জাতি।" রসনাগ্রে "শ্রীগোবিন্দ" সদাই অধিষ্ঠান করিত—আর এমন মিষ্ট কথা নাকি নবীগঞ্জে কেহ বলিতে পারিত না। তবুও পরশ্রী-কাতরগণ বলিত "ও মিছরীর ছুরি।"

নায়েব মহাশয় বিপত্নীক—অপুত্রক; কোন বালাই নাই—তবে মানুষ 'একা না ভেকা' তাই তিনি ভজন সাধনের জন্য গোপনে পরম রসময়ী ললিত-লবঙ্গলতাসম গৌরী নাম্নী বৈষ্ণবীর সাহায্য লইতেন। নায়েব মহাশয়ের 'দু পয়সা' প্রাপ্তি ছিল বলিয়া গৌরীর পিতা ভজনদাস বৈরাগী, নিশীথে কন্যার অসতর্ক গতিবিধিতে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া পরম উদাসীনের মত মুদ্রিতনেত্রে প্রভুর চরণ-রাজীব ধ্যান করিত। দুষ্টলোকে হাসাহাসি করিত পাড়ার পরছিদ্রান্বেষণে-পরমউৎসাহবতী নিদ্রাহার-পরিত্যাগকারিণী কামিনীকুলের উচ্ছৃঙ্খল রসনা কত কি জল্পনা কল্পনা করিত। উদ্বেলিত-যৌবনা অনন্ত রূপ-সৌন্দর্য্য-শালিনী গৌরীর কাণে কোন কথা উঠিলে, সে ঠোঁট উল্টাইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, নাক সিঁটকাইয়া, বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিত—"ও যাদের মন ময়লা তারা বলে—রাধা ভাব যার মনে আছে তার কোন পাপ নাই—আর মানুষটাকে কি সত্যই খানে খারাপ করে দিতে হবে—অমন একটা ভক্ত যদি সাধন ভজন না করতে পায় তো ধর্ম্মের মুখ পুড়ে যাবে না?" কলিকালের সাক্ষাৎ রাধিকারূপিণী পবিত্রহৃদয়া গৌরীর এই অকারণ মুখাগ্নি হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার প্রয়াস সকলে বুঝিত কি না বলা যায় না, তবে অগত্যা সকলকে নীরব হইতে হইত; কারণ, গৌরীর রসনা উগ্র শক্তিশালিনী এবং অতীব

প্রভাবান্বিতা, অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত ইহার উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের আবির্ভাবে অট্টালিকা ধ্বংসের ন্যায় অনেকের কুলমর্য্যাদা ধ্বংশ হওয়া অসম্ভব ছিল না; কারণ প্রতি গৃহের অতি ক্ষুদ্র কলঙ্ক কাহিনীও গৌরীর অজানিত ছিল না—সুতরাং অন্তরালে যে যাহাই বলুক তাহার সম্মুখে 'দন্তস্ফুট' করিবার মত সাহস কাহারও কুলাইত না। একদিন গ্রাম্য পুরোহিত যদুনাথ আচার্য্য তাহাকে শাসন করিতে গিয়া এইরূপ একটি ঘূর্ণিকাবর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিলেন; গৌরী যখন তাঁহার বিধবা ভাদ্রবধূর কাশীগমনের কারণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল তখন কেবলমাত্র তাহার পায়ে হাত না ঠেকাইয়া পায়ে ধরিয়া অব্যাহতি ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে পলাইয়া আসিয়াছিলেন—তদবধি গৌরীর কথা লইয়া খুব কমই নাড়াচাড়া হইত। রূপগুণসমন্বিতা বিদ্যুতবরণী বিলোলকটাক্ষশালিনী সুমধুর হাসিনী প্রখরভাষিণী গৌরীর খর্পরে পড়িয়া নায়েব প্রবরকেও বেশী ট্যাঁ-ফোঁ করিতে হইত না। গৌরী তাহার ক্ষমতার দৌড় জানিত এবং তাহা পরিচালনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইত। তার উপর সে সামান্য লেখাপড়া জানিত এবং স্বর তালমানে অভিজ্ঞা না হইলেও সুকণ্ঠী ছিল; তাহার সঙ্গীতের একটু নবীনত্ব ছিল এবং সঙ্গীতকালীন তাহার তরল চাহনীতে ভাবমুগ্ধ হইতে ও অক্ষিপল্লবগুলি অশ্রুসিক্ত হইয়া শ্রোতার হৃদয় আর্দ্র করিতে অপারগ হইত না। সে যখন খঞ্জনী বাজাইয়া চণ্ডীদাসের গান গাহিত—তখন প্রেমরসার্দ্র হৃদয়ে হলধর হালদার ভাবিত এই বুঝি সেই "রজকিনী রামী" এবং আমিই বুঝি সেই পরম ভাগ্যবান চণ্ডীদাস।

নায়েব মহাশয়ের মধ্যাহ্নিক নিদ্রা একটা প্রাত্যাহিক কর্ম্ম - ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই; কারণ এখানে তাঁহার উপরওলা কেহ ছিল না; তিনি সেখানকার একমাত্র অধীশ্বর—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাট্ বিশেষ—তিনিই জজ, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্—জমিদারীটা কলিকাতার মহারাজোপাধিক সেনবংশীয়গণের—তবে তাঁহাদের কেহই ম্যালেরিয়া—ভীতিতে সেই অসভ্য দেশে কখনও পদার্পণ করিতেন না—বৎসরে মাত্র দুই দিনের জন্য দুইবার কলিকাতায় গিয়া পূজার ও চৈৎ কিস্তির আদায় জমা দিয়া, হিসাব দাখিল করিয়া আসিতেন—যাইবার সময় অবশ্য ম্যানেজারবাবুর জন্য সুপক্ক গ্রামজাত মর্ত্তমানরম্ভার কাঁধি, গব্যঘৃত, কাঁচা আম, বৃহদাকৃতি সুপক্ক পেপে প্রভৃতি বিনামূল্যে সংগৃহীত অথচ সহরবাসীর লোভজনক, রমণীয় উপহার সম্ভার লইয়া যাইতেন—তজ্জন্য তাঁহার হিসাবে কখনও গোলযোগ হইত না। নায়েব মহাশয়ের আর একটী পরম গুণ ছিল—তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সেই ১২৲ টাকা বেতনেই সন্তুষ্ট আছেন—কখন বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন নাই—ম্যানেজারবাবু দু একবার তজ্জন্য দুঃখ করিলে - তিনি বলিতেন "আমি একা মানুষ হুজুর—একটা পেট—তাও একবেলা খাই, তিনকুলে কেউ নাই—কার জন্য আর আবেদন নিবেদন করিব—আশীর্ব্বাদ করুন যে ক'টা দিন বাঁচি যেন আপনাদের চরণতলে কাটিয়ে প্রভুর পায়ে গিয়ে পৌছাই।"

বিষয়াসক্তিবিরহিত—অর্থোপার্জ্জনে বিমুখ, নিস্পৃহ এই প্রৌঢ়টীর এই সন্তুষ্ট বাক্যে

ম্যানেজার কেন রাজাবাবুরাও বড় খুসী ছিলেন—তজ্জন্য মফঃস্বল হইতে মধ্যে মধ্যে নায়েবের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া যেসব বেনামী পত্র সদরে আসিত—তাহাতে কেহ দৃকপাতও করিত না—এমন কি মাঝে মাঝে বাংলা সাপ্তাহিকে প্রেরিত পত্রের মধ্যে এমন দুএকটা চিঠি ছাপা হইয়া গেলেও তাহা শত্রুপক্ষের রটনা বলিয়া সকলে উড়াইয়া দিতেন।

সন্ধ্যার ষ্টীমারে রওয়ানা হইয়া পরদিন প্রাতে সদরে হাজির হইয়া, খাজনা দাখিল করিয়া, স্বপাকে রন্ধন ও ভোজন সমাপ্ত করিয়া সেইদিনই প্রত্যাগমন করা নায়েব মহাশয়ের নিয়ম ছিল—ম্যানেজারবাবু হাসিয়া একদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে মৃদু হাসিয়া হলধর বলিত "গেঁয়ো লোকদের চেনেন না দেবতা—তিন দিন না থাকিলেই এরাতে কাছারী লুট করে আগুন লাগিয়ে বসে থাকবে, বেঁচে আছি কেবল আপনাদের আশীর্ব্বাদে আর শ্রীগোবিন্দের দয়ায়।" ম্যানেজারবাবু আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু এই বৃদ্ধের কার্য্য-কারিতায় অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সেই ভাবস্পর্শহীন নির্ব্বিকার পাকাআমের মতন মুখটীর দিকে নীরবে প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। কলিকাতায় এই স্বল্পসময় অবস্থান হেতু নায়েব মহাশয়ের ভাগ্যে কখন প্রভুদের দর্শনলাভ হইত না। প্রভুগণ বাগান হইতে ১টার কম ফিরিতেন না, আসিয়াই স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন আবার সন্ধ্যা না হইলে শয্যা ত্যাগ করিতেন না—এবং জলযোগান্তে সন্ধ্যার পর আবার মোটরারোহণে বাগানে গমন করিতেন; সুতরাং এই পরম ভক্তটীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার মত সুযোগ তাহারা পাইতেন না—কিন্তু ইহা হইতেই একটা বিষম অনর্থ ঘটিয়াছিল, পরে ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিব।

নায়েব মহাশয়ের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া গ্রাম্য পিয়ন লোচন মণ্ডল হাঁকিল "বড়কর্ত্তা পত্র আছে।" লোচনের গঞ্জিকা-বিধ্বস্ত ভৈরব কণ্ঠে জাগ্রত হইয়া কর্ত্তা হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন—যথাবিহিত দুটা তুড়ি মারিয়া—তিনবার গোবিন্দ স্মরণ করিয়া দু'চারবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া কর্ত্তা উঠিয়া বলিলেন "কার পত্র হে মোড়লের পো"। মোড়লের পো চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে বসিয়া বলিল "এজ্ঞে আপনারই" "আমার পত্র কিহে তিনকুলে কেউ নাই দশ বচ্ছরে কখনও একখানা পত্র আসেনি—আজ আবার পত্র লেখে কেহে? কৈ দাওতো দেখি" বলিয়া কুলুঙ্গি থেকে বঙ্গবাসীর উপহারের একখানি বহুপঠিত, মলিন, ছিন্ন, মসালিপ্ত চৈতন্য-চরিতামৃতের উপর স্থাপিত দড়িবাঁধা চসমাটীকে নাসাগ্রে সংস্থাপিত করিয়া দুএকবার নাড়াচাড়া দিয়া কোনমতে ঠিক করিয়া পত্র হাতে করিয়া শিরোনামা পাঠ করিলেন

"কল্যাণবর শ্রীহলধর হালদার—
অশেষ আশীর্ব্বাদভাজনেষু—
নায়েব—তালুক নবীগঞ্জ
থানা—খুনাচুটী—জিলা নদীয়া।

"এজ্ঞে আপনার বটেত কর্ত্তা ? তাহলে এখন আসতে পারি" বলিয়া লোচন মণ্ডল সংশয়াকুলিত নেত্রে নায়েব মহাশয়ের বিস্ময়ান্বিত বদনমণ্ডল দৃষ্টিপাত করিতেছিল—"হঁ—আমারই বটে" বলিয়া হলধর চিঠিখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন—মণ্ডলের পো প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। নায়েব মহাশয়ের পত্র খুলিতে যেন ভরসা হইতেছিল না—অনেকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর ভরসা করিয়া পত্র খুলিয়া দেখিলেন সেটা এষ্টেটের ছাপা কাগজে লেখা, পত্র নিম্নবৎ-

অশেষ কল্যাণভাজন শ্রীহলধর হালদার—

সদর নায়েব তালুক—নবাগঞ্জ।

অত্র পত্রে তোমাকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে শ্রীল শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল সেন বাহাদুর সপরিবারে ও সবান্ধবে উক্ত কাছারী পরিদর্শনে যাইবেন—কাছারীবাটী উপযুক্ত ভাবে মেরামতী করাইয়া রাখিবা ও যাহাতে কোন বিষয়ে উক্ত অশেষগুণসম্পন্ন কুমার-বাহাদুরের কোনরূপ ক্লেশ বা বিরক্তি না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবা-চাকর বাকর নিযুক্ত করিবে না কারণ তৎসমস্তই তাঁহার সঙ্গে যাইবে—অধিক লিখা বাহুল্য কারণ তুমি ষ্টেটের পুরাতন কর্ম্মচারী অলমিতি বিস্তরেণ ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ

ম্যানেজার সেন-- রাজষ্টেট।"

পত্র পাঠে ঘুমের যা কিছু জের চক্ষে লাগিয়াছিল সব যেন কর্পূরের মত উপিয়া গেল – মনের মধ্যে যেন একটা দুর্ভাবনা প্রেতের মত বীভৎসাকারে দেখা দিল, নায়েব ভাবিলেন "এ নিশ্চয় গাঁয়ের শত্রুর কাজ—নইলে যারা কোন পুরুষে এদিক মাড়ায় না—তারা কেন এখানে, এই মশার আড্ডা, ম্যালেরিয়ার আড়ৎ এই লক্ষ্মীছাড়া গাঁয়ে আসতে যাবে—তারপর আসছেন কিনা ছোটবাবু। নায়েব ছোটবাবুর রাগী মেজাজ ও কড়া ধাতের অনেক গল্প শুনিয়াছিল—তার উপর আবার সস্ত্রীক, অর্থাৎ বেশীদিন থাকবার মতলব এত শুভ লক্ষণ নহে—হিসাবে অবশ্য তাঁহাকে ধরা ছোঁয়ার যো নাই কাগজপত্র খুব দুরস্তই আছে, তবে পাচ বেটাবেটী শত্রুর কাণভাঙানী দেবে তার কি উপায় ? আচ্ছা, গোবিন্দ আছেন—এ যাত্রা যদি কেটে বেরুতে পারি তো দেখে নেবো সব শালাকে—নখের উপর টীপে উকুনের মত মারবো-- তবে আমার নাম হলধর হালদার।"

সেদিনকার মত হলধরের ঘুমটা চটিয়া গেল—এবং মনটা কেমন বিকৃত হইয়া গেল—অপরাহ্নে জলযোগের আয়োজনের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না – সায়াহ্নে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে বসিয়া তাহার অর্থ যেন বোধগম্য হইল না--দারুণ চিন্তায় অবসন্ন হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হলধর বলিয়া উঠিল "গোবিন্দ হে ! তোমারই ইচ্ছা প্রভু- যদি বুড়ো বয়সে ভক্তকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে তাই দাও"—এমন সময় পেছনের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের চুড়ীর ঠুন্ ঠুন্ করিয়া আওয়াজ হইল – বিস্মিত হলধর চাহিয়া দেখিল—অন্য কেহ নহে রাধিকা-

রূপিণী, সুমধুর হাসিনী গৌরী—গৌরী বলিল -"একি আজ এমন করে বসে কেন? মুখ চোক শুকিয়ে গেছে—আবার কি পেটের অসুখ হল নাকি?" এ অসুখটা মাঝে মাঝে তাহার হইত সেটা গৌরী জানিত; একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "এইযে এসেছ, রসময়ী রাধা যখন এসেছেন তখন আর ভাবনা কি—এতো ভাই শরীরের অসুখ"—"বুড়ো বয়সে আবার মনের অসুখ হয় নাকি" "আরে গোবিন্দ! গোবিন্দ! সে অসুখ নয় গৌরী সে অসুখ নয় এ অন্য রকম" "কি রকম, কি রকম শুনি" বলিয়া গৌরী একটা মাদুর বিছাইয়া বসিল—হলধর উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া তাহার সামনে বসিয়া একে একে পত্রের বারতা জানাইলেন। গৌরী শুনিয়া হাসিয়া বলিল "এই কথা, এরি জন্যে এত ভাবনা তোমার মত কাচাআলগা বেটা ছেলে যে কি করে নায়েবী করে তা জানিনে—এখন নাও উঠ—একটু জলটল খেয়ে সুস্থ হয়ে বসো আমি একটা পদ শুনিয়ে যাই।" বলিয়া ঈষৎ হাসিল, সেই হাসির আলোর একটা ঝলক যেন তাহার কাণের ইতুদি মাকড়ী দুইটার উপর ঝিলিক মারিয়া গেল। হলধর নিরাশার অন্ধকারে যেন একটু ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। গৌরী বুকটা একটু ফুলাইয়া মুখটা একটু ঘোরাইয়া, চোখ দুটা একটু নাচাইয়া, হাসিটা একটু ছিটাইয়া বলিল "আমি থাকতে তোমার ভাবনা কি? তোমার বাবু যখন কল্‌কেতার ছোকরা বাবু—তখন তাঁকে আমি ঠিক চালিয়ে নেব—" "পারবি গৌরী, পারবি তা যদি পারিস ভাই—তা'হলে মাইরী বল্‌ছি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব। তবে একটা অসুবিধা আছে—বাবুর বৌ যে সঙ্গে আস্‌ছে" "আসুক্ গে না তাতে তোরই বা কি আর আমারই বা কি—বৌ থাকলে যদি বাবুরা বারমুখো না হতো—তা'হলে আর ভাবনা কি—বাবুদের তা'হলে আর প্রাণ বাঁচতো না—তা থাক্—সে ভাবনা তোর নয়—সে আমি বুঝব।" হলধর তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটা আশ্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার নিত্যকর্মে রত হইল। অকূল সাগরে ভেলার মত এই যুবতীর উজ্জ্বলরূপ ও প্রখর যৌবনের সাহায্যে যদি এই বিপদ কাটিয়া যায়—সেই কল্পনায় সে নিমগ্ন রহিল।

(৩)

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে গ্রাম সরগরম হইয়া পড়িল—ঘরামী আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের চালে খুঁচি দিতে বসিল—রাজমিস্ত্রী আসিয়া শাণের পোতাটায় সিমেণ্টের পটী লাগাইতে সুরু করিল—দুটা জন ধরিয়া ভিতরের ঘরগুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সাফ করা হইল কাছারী বাড়ী হইতে নদী-তীর পর্য্যন্ত রাস্তা চাঁচিয়া ছুলিয়া সাফ হইতে সুরু হইল। গ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল দুর্দ্দান্ত ছোট-কুমার-বাহাদুর চাবুক হাতে করিয়া প্রজাশাসনে আসিতেছেন—এবার গেরস্তর বৌঝির টেঁকা ভার হইবে—ভট্টাচার্য্যদের টিকিগুলি ২।৭ টাকা মূল্যে খরিদ হইবে মোট কথা কাহারও নিস্তার থাকিবে না—সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল—যার বাড়ীর খেজুর পাতার বেড়া ভাঙ্গা ছিল—সে

দুটা খেজুর ডাল সেখানে গুঁজিয়া লজ্জা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিল—যার পুকুর ঘাট দর্মা দিয়া আবৃত থাকিয়া সীমন্তিনীদের গাত্র-ধাবন-কালীন নগ্নতা ঢাকিয়া রাখিত—সে আবার দরমার বড় বড় ছিদ্র ভরাইতে ব্যস্ত হইল—যার ঘরের জানালা রাস্তার উপর, সে পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া জানলায় পর্দ্দা ঝুলাইল। মোটের উপর অসূর্য্য বা "অকুমার-বাহাদুর-পশ্য" হইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু একথা প্রচার হইল কি করিয়া—হলধর কাহারও সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করে নাই তথচ এত অল্প সময়ে এমন তাড়াতাড়ি, করিয়া এ সংবাদ কি পল্লীগেজেটে প্রকাশিত হইল সে ভাবিয়া পাইল না—কিন্তু আমরা জানি, এ সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রচার-কার্য্য-কুশলা অক্লান্ত-রসনা গৌরীর কাণ্ড। হায় গৌরী! তুমি যদি সেই তোমার রসজ্ঞানহীন, অসভ্য পল্লীগ্রামে না থাকিয়া কলিকাতায় থাকিতে, হয়ত সরকারী পাবলিসিটী বোর্ডের আফিসার হইতে পারিতে—কিন্তু কি করিবে বল সবই অদৃষ্ট নতুবা এমন বহুমূল্য নয়নানন্দকর গজমতি হার শেষে পল্লীমর্কটের কণ্ঠাবলম্বী হইবে কেন?

যাই হোক ঘন ঘন তাগাদায় কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হইতেছিল—কারণ কুমার-বাহাদুর কবে আসিবেন—কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না। বড় লোকের ছেলের খেয়াল তো—হয়তো নাও আসিতে পারেন—মতলব বদলাইতেই বা কতক্ষণ—ইত্যাদি নানা চিন্তায় হলধর ব্যাপৃত ছিল—কিন্তু তাহার আশাপূর্ণ হইল না—সন্ধ্যার ষ্টীমারে বড় বড় দুইটা কাঠের বাক্স ও কয়েকটা ট্রাঙ্ক আসিয়া ষ্টীমার ঘাটে পৌছিয়া কুমার-বাহাদুরের আগমন বার্ত্তা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া দিল। আবার হলধরের মুখ শুকাইল; যাহা হউক যাহা ঘটিবেই- বৃথা দুশ্চিন্তায় যাহা রোধ হইবার নহে তাহার জন্য শোক প্রকাশে ফল কি—এইরূপে মনকে বুঝাইয়া হলধর আবার কর্ম্মে মন দিল—ভাবিল গৌরা যখন সহায় তখন তাহার আর ভাবনা কি।

পরদিন প্রভাত হইতেই হলধর দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ সুরু করিয়া দিল - গ্রামের মুদী ছিদাম পাল আসিয়া দুএকবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া—যাহাতে কুমার বাহাদুরের সেবার দ্রব্যাদি তাহাকে সরবরাহ করিতে অনুগ্রহ হয় সে কথাটাই বিশেষভাবে জানাইল—হলধর তাহাকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া বলিল "দেখ পালের পো! সে সব হবে কিন্তু ফন্দের টাকা আমার হাত দিয়েই যাবে তা জান তো।" "আজ্ঞে হালদার মশাই তাকি আর জানিনে—তবে আপনার প্রণামী থাকবে বৈকি।" "ও বৈকি টৈকির কথা নয়—যা মোট টাকা হবে তার দশ আনা তোমার ছয় আনা আমার—এই বন্দোবস্তে রাজী হও—সব তোমার একচেটে—আর নয়তো ও পাড়ার হরি বিশ্বেস পাবে—সে এতে রাজী, এমন কি আমায় আগাম দশটাকা দিতে স্বীকার পেয়েছে।" পালেরপো কর্ত্তার সূক্ষ্ম হিসাব দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল—কিন্তু এত বড় কাৎলা হাত ছাড়াও করা যায় না বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পাচটী টাকা তাহার হাতে দিয়া একটী প্রণাম করিয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ করুণ কর্ত্তা, দুপয়সা যেন পাই—আপনার ভাগ যাবে কোথায়—আপনি হলেন যজ্ঞেশ্বর" বলিয়া হা-হা-হা

করিয়া দাঁত বাহির করিয়া খানিকটা হাসিল। প্রত্যুত্তরে হলধরও একটু হাসিয়া বলিল "বটেই ত ছিদাম—তুমি হলে গাঁয়ের লোক, রাজা-বাহাদুরের প্রজা, তুমি থাকতে কি একাজ অপরে পেতে পারে হে—তা তুমি আমায় দুপয়সা কম দিলেও কি আমি তোমায় ছাড়তে পারি" "তা বৈকি—আপনাদের দয়াইতো বেঁচে আছি আপনিই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা" বলিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিয়া শ্রীদাম পাল প্রস্থান করিল। হলধর টাকা কয়টা ট্যাঁকে নিরাপদ স্থানে পাচ দিয়া গুঁজিয়া আবার ঘরামী তাড়নায় ব্যস্ত হইলেন।

এমন সময়ে অদূরে হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করিয়া বিকট আওয়াজ হইল গ্রামবাসীদের মধ্যে গারু ঘোষ একটু কল্‌কেতা-ঘেঁসা—সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হালদার মশাই পেল্লকাণ্ড একটা হাওয়ার গাড়ী আস্‌ছে—বোধ হয় কুমার-বাহাদুর আসছেন দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড গর্জ্জনে পল্লীর শান্তিভঙ্গ করিয়া ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় একখানা মোটর আসিয়া থামিল পাড়ার লোকগুলি এই অপূর্ব্ব জীব দেখিতে ছুটিয়া আসিল—গাড়ী হইতে দুইজন যুবাপুরুষ,একজন ছোট একটী বালক ও একটী সিল্কের ওড়না-ঢাকা রূপসী নামিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন দোহারা পুরু, আর এক জন যুবা, রোগা লম্বা এক্‌হারা, ছিপ্‌-ছিপে—ঘাড়েতে চুল নাই কেবল সামনে এক ঝাঁক চুল ফিরিয়া একটা জোর টেরী ফুটিয়া উঠিয়াছে—চোকদুটি ছোট ছোট—তার উপর চুলু চুলু—গোঁফের আধখানা কামান—গায়ের সাঁচ্চার কাজ করা সিল্কের পাঞ্জাবী পায়ে রেসমী মোজা ও সোনালী পম্পসু—হাতে একটা রূপা বাঁধান লিক্‌লিকে বেত মুখে একটা অর্দ্ধ—প্রজ্জ্বলিত সিগারেট—তিনি গাড়ি থামিবা মাত্র তড়াক্‌ করিয়া নামিয়া বলিলেন - ওহে সেন-রাজ-এষ্টেটের কাছারী কোনটা? হলধর যুক্তকরে অগ্রসর হইয়া বলিল—"হুজুর আমিই এখানকার নায়েব এই কাছারী বাড়ী"—"এই কাছারী" বলিয়া চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সিগারেট্‌টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। "এখানে মানুষ থাকবে কি করে—বাবার যেমন কাণ্ড আমায় পাঠালেন জমিদারী দেখতে কিহে অমূল্য এখানে মানুষে থাক্‌তে পারে?" তারপর হলধরের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ওহে তুমিই নায়েব বল্লে না"—হলধর "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর" বলিয়া হলধর আর দুপা আগাইল। "ওহে নায়েব—না নায়েব মশাই এখানের জল খেলে বমি হবে না তো"—"আজ্ঞে হুজুর চুর্ণীর জল বড় মিষ্টি যেন চিনির সরবৎ।" "তাতো তোমার মুখের কথাতেই বুঝছি—এখানে সোডা লেমনেড পাওয়া যায়তো—নইলে বাবা মালপত্র চল্‌বে কি করে—কি বলহে বুড়ো ইয়ার—তোমার মলিটাল চলে না।" "আজ্ঞে, অমন আজ্ঞে করবেন না হুজুর—আমি বুড়ো মানুষ—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে"—"ওহে কুমার বাহাদুর বৌরাণীকে যে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে ও নায়েব মশাই এখানে ঝি টি কেউ নেই" পত্রে ঝি চাকর নিয়োগের নিষেধ থাকায় হলধর সে সব করে নাই—এখন বড়ই বিপদে পড়িল—মাথা চুলকাইয়া, ঘামিয়া অস্থির হইয়া পড়িল—এমন সময় মরালের মত ধীর পদবিক্ষেপে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী আধ ঘোম্‌টা টানিয়া আসিয়া মোটরের কাছে গিয়া বৌরাণীর হাত ধরিয়া কাছারী বাড়ীর অন্দরে লইয়া গেল—হলধর সবিস্ময়ে দেখিল গৌরী। কুমার বাহাদুরও একবার দেখিয়া

লইয়া বলিলেন "ওহে অমূল্য এযে একটা Twinkle Twinkle little star বাবা—তাহলে এখানেও go-to-hell করা চলবে।" অমূল্য গম্ভীর ভাবে বলিল "Don't be a fool—behave yourself" পরে নায়েবের দিকে ফিরিয়া বলিল "ওহে ষ্টীমারঘাটে আমাদের জিনিস পত্তর আসবার কথা ছিল এসেছে কি না জান?" "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, সে সংবাদ না নিয়ে কি আমি নিশ্চিন্ত আছি—সে সব আমি ব্যবস্থা করে আনাচ্ছি—আপনারা উঠে উপরে চলুন—স্থির হোন" অমূল্য নামধারী ব্যক্তিটী বলিলেন "না হে না সে সব আমি নিজে গিয়ে বুঝে আনব—তুমি ১০।১২ জন লোক দেখে দাও, বেশ জোয়ান চাই—তোমার পিলে রুগীর কম্ম নয়—বুঝলে—রাজ এষ্টেটের জিনিষ—খুব ভারী ভারী জিনিষ" কুমার-বাহাদুর উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপে একটা সতরঞ্চে বসিয়া—একটা সিগারেট ধরাইলেন—পল্লীর বৃদ্ধগণ তাঁহার 'মধু-ভাষ' শুনিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন—কেবল ছেলেরদলই গাড়ীর আশেপাশে সন্তর্পণে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছিল। নিতাই হাজরার মেয়ে খুকী তার ভাই পচাকে কোলে করিয়া হাওয়ার গাড়ী দেখিতে আসিয়াছিল—তাহার ভাই আধ আধ-কথায় বলিল—"এই আজা" "হ্যাঁরে পাজি চুপ কর রাজা ধরে নেবে"—রাজা ততক্ষণে সিল্কের চাদরটা পাকাইয়া মাথায় দিয়া সতরঞ্চির উপর "ফেলাট" হইয়া পড়িয়া দম্ দিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন—আর দ্বারদেশে হলধর পরম ভক্ত গরুড়ের মত যুক্তকরে দণ্ডায়মান ছিলেন—সিধু পরামাণিকের পঞ্চম বর্ষীয় উলঙ্গপুত্র মাণ্‌কে কোমরে ঘুনসীতে বাঁধা একটা ছেঁদা করা আধলা নাচাইতে নাচাইতে দৌড়াইয়া আসিল—এমন সময়ে ড্রাইভার গজধর সিং হরণটা টিপিয়া দেওয়ায় ভোঁ ভোঁ করিয়া আওয়াজ হইলে—মাণ্‌কেও পরমানন্দে মুখে "ভোঁক" "ভোঁক" শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া পলাইল!

ইতিমধ্যে ষ্টীমার ঘাট হইতে মুটের দল হৈ হৈ শব্দে আসিয়া পৌছিল—অমূল্য বাবু সমস্ত সঙ্গে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। পরে মোটর খানার জন্য একটা "টেম্পরারী' হোগলা বা দর্মার ছাউনি করিয়া দিতে বলিলেন। এতক্ষণে কুমার-বাহাদুরের মেজাজটা অনেকটা 'ক্লিয়ার' হইয়াছিল—তাই তিনি উঠিয়া আড়ভাবে বসিলেন। পাড়ার লোকেরা এষ্টেটের ভারী জিনিষের কথা অবগত হইয়া পরম বিস্মিত হইল—মুটেরা যখন বলিল ৮।৫ জনে এক একটা বাক্স আনিয়াছে—তখন শ্রীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিখান্দোলন করিয়া বলিলেন "ওতে নিশ্চয় সোণারূপার বাসন আছে—কি জান হে তর্করত্ন! এঁদের পূর্ব্বপুরুষ কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে জুটেইতো নবাব আলীবর্দ্দীকে মারেন—এসব সেই নবাবী আমলের লুটের মাল" তর্করত্ন বলিলেন "তাতে আর বিচিত্র কি—হয়তো বা কুমার-বাহাদুর ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দান করিবেন বলিয়া ওসব আনিয়াছেন তবে কথাটা হচ্ছে আমরা তো ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির দান গ্রহণ করি না।" বলিয়াই একটিপ্ নস্য লইলেন। "কি বলো যে তর্করত্ন তার ঠিক নাই, একে ওঁরা ভূস্বামী অর্থাৎ কিনা রাজা, আর সত্যই তো বর্ত্তমান কর্ত্তাতো সরকার বাহাদুরের কাছে রাজা উপাধিই পাইয়াছেন—সুতরাং এঁদের কাছে দান গ্রহণে পাতিত্যের কোন আশঙ্কা নাই।" তর্করত্ন উত্তর করিলেন "দেখ শ্রীধর—ও বিষয়ে তোমার

সহিত আমার মতান্তর নাই—তবে শাস্ত্রের কথা যা তাই বললাম—কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যবস্থার মধ্যে এটাকে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।" যখন এই ব্যতিক্রম ব্যবস্থা হইতেছিল—তখন হলধর চণ্ডী-মণ্ডপের গায়ে একটা চাল তুলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অমূল্য যাইয়া কুমারবাহাদুরের পাশে দাঁড়াইয়া একবার সন্দিগ্ধভাবে ঘরের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইয়া বলিল "যাক্ এসব কিন্তু সরাতে হচ্ছে—বাড়ীর ভেতরটা এক রকম বেশ ঘেরা ঘোরা—কোন রকম অসুবিধা নাই।" "থানা কোথায় খবর নিয়েছ?" "তা না নিয়ে কি আর অমনি বসে আছি—সে ৬।৭ ক্রোশ দূর" "স্থান নির্ব্বাচন ঠিক হয়েছে—তাগ্ ও বেশ লেগেছে— এখন তুমি মাল টেনে সব বেঁফাস না কর" "খবর্দ্দার ষ্টুপিড্—মুখের সামনে নিন্দা করিস না জানিস্ মণি মুখুজ্যে না থাকলে তুইও এখানে টেঁকতে পার্ত্তিস না—এমন কুমার-বাহাদুর কে হ'তোরে? আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যিই সেই গুঁফোবেটার ছেলে।" "না তোর বুদ্ধির তুলনা নেই, তবে যা দোষ ঐ মদ আর মেয়ে মানুষ—এ দুটো ছেড়ে দিতে পারলেতো আমীর হ'য়ে যেতে পারতিস্"—"আরে রাস্কেল্, পয়সা উপায় কিসের জন্য—যদি পৃথিবীতে enjoy না কর্লি—তবে জন্মালি কিসের জন্য? —আমি বাবা অত বুঝিনা—খাও দাও ফুর্ত্তি মারো—হেসে নাও দুদিন বৈত নয়"—বলিয়া সুর ধরিলেন। অমূল্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল "কি যে ছেলেমিপনা করিস্ তার ঠিক নাই—ঐ বুড়ো বেটা বাস্তু ঘুঘু—চালচলনে খুব হুঁসিয়ার—হ্যাঁ আর এক কথা, ভেতরে সেই রূপসীটি আসর জমকে বসে আছেন—সেটীকেও সরাতে হবে—কি জানি বাবা 'সুকা' যদি চাল ঠিক না রাখতে পারে—ভেতরে বাবা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—একেবারে 'স্পীকটী নট্' " মণি মুখুজ্যে ওরফে কুমার বাহাদুর উঠিয়া বলিলেন "কিন্তু যাই বল্ অমূল্য ওটা একটা চীজ,—তোর সুকীর চেয়ে ঢের ভাল—আমি বাবা ওটাকে হাতাচ্ছি—তুমি বরং সুকীকে সুখী কোরো—আমার ওতে আর প্রবৃত্তি নাই।" "তুই একেবারে অধঃপাতে গেছিস্—ও রকম করলে তো আমি এসবে থাক্‌বো না বলছি" "ওরে অমূল্য রাগ করিস্‌নি, তুই রাগ করলে কি চলবে—আচ্ছা ভাই এখন কিছু করবো না—কিন্তু যাবার সময় ওটাকে সঙ্গে নেব—তা কিন্তু বলে দিচ্ছি—" "এখন তো দুর্গা বলে কার্য্য সুরু কর—শেষের কথা শেষে হবে—এখন ৫।৭ লাখ এখান থেকে কাল করে বেরুতে পারি তো ওতো কি দেখ্‌ছিস আমি তোকে ডানা কাটা পরী ধরে দেব।" "হলধর" বলিয়া কুমার-বাহাদুর চেঁচাইয়া উঠিলেন। হলধর সভয়ে ছুটীয়া আসিয়া দেখিল—কুমার-বাহাদুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন—আর অমূল্য বসিয়া ঘন ঘন পাখা নাড়িতেছে।

(গ)

অন্দরে বৌরাণীকে লইয়া যাইয়া গৌরী দেখিল দেখিল সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিতা হইলেও বৌরাণী খুব উঁচুদরের রূপসী নহেন—বড়লোকের ঘরের মত তো নয়ই, এমন কি গৌরী বৈষ্ণবীর মত ও নয় · বৌরাণীর গায়ের চামড়াটা ফ্যাকাসে বটে তবে তাতে না আছে লালিত্য না আছে কমনীয়তা—হাত পা গুলো শক্ত শিঁটে শিঁটে ; বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বৌ ননীর মত হাত পা হবে—তা, না একি—এ যেন দাসী চাকরাণীর হাত পা—চোখ দুটা খুব বড় ও উজ্জ্বল—কিন্তু তাতে যেন একটা কুৎসিত ভঙ্গী সর্ব্বদা উঁকি মারিতেছে—সেটা যেন ভদ্রঘরের কুল মহিলার পক্ষে একান্তই অশোভন—চোখের কোলগুলি কাল—যেন কালী ঢালা—তবে ঢং ঢাংটা খুব ছিল—গৌরী ভাবিল কলিকাতায় বুঝি একেই সুন্দরী বলে—আর বড় মানুষের মেয়েদের রূপতো বাপের টাকায় লেগে থাকে—তাই আর সে কিছু বলিল না। দুএকবার আলাপের চেষ্টা করিয়া দেখিল সে বড় কঠিন ঠাঁই—বৌরাণী সহজে আমল দেন না। তাই সে আর বেশী ঔৎসুক্য না দেখাইয়া ঘরের বাহিরে দাওয়ায় যাইয়া বসিল—বৌরাণীও ঘরের ভিতরে যাইয়া ওড়না ব্লাউজ্ প্রভৃতি খুলিলেন—সঙ্গে এক্টা ছোট ট্রাঙ্ক আসিয়াছিল—তাহা খুলিয়া একখানা চওড়া জরী পেড়ে শাড়ী বাহির করিয়া পরিয়া বেনারসী খানা তুলিয়া রাখিলেন, একটা মস্ত বড় জার্ম্মান সিল্ভারের বই ডিবা হইতে দুটা পান বাহির করিয়া মুখে দিলেন—আর একটা ছোট কৌটা হইতে খানিক্টা জর্দ্দা মুখে দিলেন—তারপর দুহাত দিয়া মাথার চুলগুলা একটু সংযত করিয়া—পানের পিক্ ফেলিতে আসিয়া দেখিলেন—গৌরী নতমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছে—আর বাঁ পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা কোঁচকাইয়া মেঝেতে ঘসিতেছে—চতুরা সুখদা ওরফে সুকী বুঝিল এটী ক্ষুরধার অস্ত্র এর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ—একে সামলানই হল কাজ—তাই হাসিমুখে গিয়া বলিল "তুমি অমন করে বসে রইলে কেন—আমরা বিদেশী তোমাদের দেশে এলুম" গৌরী বলিল "আজ্ঞে সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্য—এত দিনের ভেতর কখনও তো রাজবাড়ীর কারুর পায়ের ধুলো পড়ে নি—তবে বৌরাণী, এখানে আপনাদের বড় কষ্ট হবে। সুখদা হাসিয়া বলিল "আমায় ভাই রাণী টাণী ব'লোনা আমায় বৌদি বলেই ডেকো, রাণী-রাণী শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে—আর দেখ কল্‌কেতার সুখ আজন্ম ভোগ করে যেন অরুচি হয়েছে এখন দুদিন তবু পাড়াগাঁ দেখব—আর দেখবই বা কি যে বাবু ভাই—ভারী কড়া মেজাজ—ঘরের তো বার হতেই দেন না—এমন কি জন প্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করবার হুকুম নেই—বাড়ীতে দুটো মেয়েলোক এলেও যে দুদণ্ড গল্পগাছা করব তার যো নাই, অম্‌নি আনাগোনা সুরু করবে।" গৌরী কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তা বৌরাণী এখানে সে ভয় নেই—তোমাদের মতন রূপসী পাড়াগেঁয়ে নেই, যে বাবুর নজরে লেগে যাবে।" "আর ভাই ওদের নজরের কথা ছেড়ে দাও, ওরা কি কেবল রূপই খোঁজে

তা নয়—তা হলে আর কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে এক মাগী কাঠকুড়ুনীকে নিয়ে নিত্যি রাস কর্ত্তোনা—মাসে বোধ হয় তার পেছনে লাখো টাকা খরচ করে—"এটা সুখদার বানানো কথা। কুমার বাহাদুরের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে একটু জোর প্রমাণ দেওয়া এবং গৌরীকে সতর্ক করা। গৌরী শেষের ভাবটা গ্রহণ করিয়া মনে মনে খুসী হইল—ভাবিল এ মাছ যদি গাঁথিতে পারি—তবে কলকাতায় যাইয়া লাখ না হয় দশ বিশ হাজারেও ঘা দিতে পারিব—অন্তরের উল্লাস অন্তরে চাপিয়া মুখে বলিল "তা হলে কুমার বাহাদুরের বারট্যান্ আছে—এমন লক্ষ্মী প্রতিমে ঘরে থাকৃতে-একি প্রবৃত্তি বাবু—বড়লোকের ছেলেদের মন বোঝা ভার—তা দেখ বৌদি তোমার কোন ভয় নাই।"

বৌদি হাসিলেন—বলিলেন "তা হলেই হলো ভাই—দুদিন পালিয়ে এসেও যদি স্বোয়ামীর সেবা কর্ত্তে পাই, সেই আশাতেই ছুটে এসেছি এখন ভগবান যদি দয়া করেন -তবেই সার্থক আর নইলে—"বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের ন্যায় সুখদা ইচ্ছামাত্রেই চোখে জল আনিতে পারিত—এ বিদ্যা তাহার 'এক বাড়ীওয়ালী মাসীর কাছে শিক্ষা। সুখদারও একদিন রূপ যৌবন ছিল - সেও পাঁচজন বাবুকে ঘরে বসাইয়া দুপয়সা রোজগার করিয়াছে—এবং প্রাণপণ চেষ্টায় প্রস্থানোন্মত যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে শেষে সে যখন বুঝিল বেশীদিন এমন করিয়া আর চলিবে না তখনই "সে এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ বাড়ীর চালচলন আদব কায়দা সে মাসীর কাছে শিক্ষা করিয়াছিল—সেই ওস্তাদ মাসীর শিক্ষায় সে স্বার্থসাধনে অগ্রসর হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল —পাঠক ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন।

এই রকম কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় সেই বিপুল বিরাট্ কাঠের কেসগুলি লইয়া অমূল্য অন্দরে প্রবেশ করিল—বৌরাণী মাথায় কাপড় টানিয়া ঘরে ঢুকিল—গৌরী ও তৎপশ্চাৎ চলিল—তবে যাইবার সময় একবার পিছন ফিরিয়া একটু মুচ্‌কী হাসিয়া গেল—সেটা অমূল্যের উদ্দেশ্যে বটে; তবে সেটা তত ফলপ্রদ হইল না কারণ অমূল্য নৈতিক চরিত্রে ভীষ্মের ন্যায় না হইলেও কাজ ভুলিয়া সে আমোদ করিতে শিখে নাই—তবে বুঝিল এ একটী সাংঘাতিক অস্ত্র। সে বড় বাক্স দুইটা একটা কোণের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে তুলাইয়া রাখিল—এবং দুইটী ট্রাঙ্ক ও দু বাণ্ডিল বিছানা সুখদার কক্ষের সামনে নামাইয়া বলিল "বৌরাণী এর একটায় কুমার বাহাদুরের কাপড় চোপড় আছে আর একটায় আপনার নিজের—আপনারা বিছানা টিছানা করিয়ে নেবেন - ঠাকুরকে সব রাঁধবার যোগাড় করে নিতে বলবেন—আর এখানে ঝি টি রাখা হবে না - ঐ লোচনই সব করে কর্ম্মে দেবে এখন।" বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন—গৌরীর কৌতুহলী আঁখি দুটী অঞ্জনকে গঞ্জনা দিয়া নাচিতেছিল কিনা জানিনা—তবে সে চার ফেলিতে সুরু করিয়াছিল।

অমূল্য বাহিরে গেলে গৌরী বলিল "ওটী কে বৌদি" "কে আমার বাবুর প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলী, ঐ মুখপোড়াইতো নাটের গুরু—এখন দেখতে বেশ ভাল মানুষটী কিন্তু ভেতরে বিষের ছুরি।" "ওটী তা হলে বাবুর বন্ধু—" "তা নৈলে কি আর তার বাড়ীর ভেতর আসতে পান"

"কলকেতায় ভাই অত কড়াকড় নেই—তবু আমাদের হিঁদুর ঘরে যা হোক কিছু আছে—কিন্তু বেহ্মজ্ঞানীদের মেয়েরা সকলের সাম্‌নে বেরয়, কথা কয়" "তা বৈকি—কলকেতার চালের কথা ছেড়ে দিন—তবে এখানে পাড়াগাঁয়ে লোকের ওসব কেমন কেমন ঠেকে · তবে আপনারা রাজা কেউতো কিছু বলতে পারবে না"– কথাটা পাল্টাইবার জন্য বৌরাণী বলিলেন "হ্যাঁ ভাই তোমাদের বাড়ী কোথায়?" "আমরা আপনাদেরই প্রজা, বাড়ী আমাদের বেশীদূর নয়—পেছনের ঐ দীঘির ওপারেই আমাদের কুঁড়ে ঘর—আমার বাপের নাম 'ভজন বৈরাগী'—আমি এই নায়েব মশাইএর কাজকর্ম্ম করে দিই আমরা বোষ্টম।" "ওঃ" বলিয়া বৌরাণী ঘরে ঢুকিলেন—গৌরীকে বলিয়া গেলেন—"চাকরটাকে ভাই ডেকে দিয়ে যেও—বিছানা গুলো সব ঠিকঠাক্ করে দিয়ে একটু গোছগাছ করুক। গৌরী ভৃত্যের সন্ধানে বাহিরে গেল।

(ঘ)

হলধর যে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা ঘটে নাই—কুমার-বাহাদুর দিনেকের তরেও হিসাব দেখিতে চান নাই—বা দর্শনার্থী প্রজাবৃন্দের একজনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন নাই—যে আসিত বলিয়া দিতেন—নায়েব মশাইয়ের সঙ্গে কথা কন্ আমার ওসব চর্চ্চা করবার সময় নেই, এমনকি একদিনের জন্যও কাছারী বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যান নাই—সুতরাং ইহাতে সে যে পরম প্রীত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রামবাসীগণ একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল বটে—তবে তাহারা সুবুদ্ধির মত সেটা উড়াইয়া দিল—কারণ সেলামী বা নজরাণা হিসাবে কিছু দাবী হইল না খাজনাবৃদ্ধির আশঙ্কা ও ফলবতী হইল না—অধিকন্তু কুমার বাহাদুরের অত্যাচারপরায়ণতার বা মেয়েছেলেদের উপর দৌরাত্ম্যের কোন চিহ্ন দেখা গেল না—তারা ভাবিল আমাদের সঙ্গে না মিশুক তবে লোক মন্দ নয়, নিজের আমোদেই আছে। কেবল দুর্লভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া বলিয়াছিলেন "কলিকাল এরেই বলে তর্করত্ন, নইলে অতবড় বংশের সন্তান ক্রিয়াশূন্য—নিষ্ঠাহীন।·তবে কি জান এখন যৌবন, শোণিত উষ্ণ—আবার বয়োবৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি হইবে বৈকি।" তর্করত্ন বলিলেন "ভায়া গোড়াতেই তো বলেছি কায়স্থের দান গ্রহণ সমীচীন নহে" বলিয়া দ্রাক্ষাফলরসাস্বাদ-বঞ্চিত জম্বুকের ন্যায় বিকৃত মুখে নস্য গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

চণ্ডীমণ্ডপ এখন অমূল্যের অধিকারে—তিনি সেখানে রাত্রে শয়ন করেন – দিবাভাগে ঐখানেই মজলিস্ হয়। বাবুরা সেখানেই বেশ প্রকাশ্যে বসিয়া সুরাপান মহোৎসব করিতেন। তাঁহাদের অবস্থানকালীন হলধর তল্পী তল্পা লইয়া ভজন বৈরাগীর কুটীরে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল—ইহাতে তাহার ও সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই—কারণ ইহাতে সেই পরমপ্রেমময়ী রাধিকারূপিনী বৈষ্ণব-নন্দিনীর ঘন ঘন দর্শন ও অহোরহ সেবা লাভ করিতে পারিতেন। গৌরী সেদিন

হইতে আর কাছারী বাড়ীতে যাইতে পায় নাই—তাহাতে সে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল—সে মনে ভাবিত এসব ঐ বুড়ো নায়েবের কারসাজী—সেই বোধ হয় বাবুদের টিপিয়া দিয়া থাকিবে; নতুবা অমন সব বাবু, তাদের এ মতি হইবে কেন! সুতরাং সে মুখে কিছু না বলিলেও অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধের প্রতি প্রসন্ন ছিল না।

বাবুরা দিনের বেলায় নিদ্রা যাইতেন—আর রাত্রে মাইফেল চলিত—কারণ রাত্রে ঘরের ভিতর আলো নাড়াচাড়া করিতে দেখা যাইত এবং নানাবিধ কট্ কট্ ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হইত—এটা যে কিজন্য তাহা হলধরও বুঝিতে পারে নাই—বা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হয় নাই—তবে বাবুদের খরচের বহরটা খুব বেশী ছিল সেটা যোগাইতে যোগাইতে বৃদ্ধের প্রাণান্ত হইত। তহবিলের মজুত ও নাগাৎ যাহা কিছু আমদানী ছিল সবই নিঃশেষিত হইয়া গেল। যে দিন কুমার-বাহাদুর বলিলেন—"ওহে বুড় ইয়ার আজ অমূল্য বাবুকে কলকেতা পাঠাব, পাঁচ হাজার টাকা চাই" হলধরের মুখ শুকাইয়া গেল বলিল "হুজুর আর তো মজুদ নাই" "তা বল্লে আমি শুন্‌ব না—জমীদারীতে বসে বাপের ঠেঙ্গে টাকা চেয়ে পাঠাতে পারবো না—না থাকে কারো কাছ থেকে কর্জ্জ করে আনো" পূজোর কিস্তি আদায়ের তখনও ঢের দেরী—কাজেই মোটা সুদে টাকা ধার আরম্ভ হইল—গ্রামের যাহার যাহার হাতে নগদ টাকা ছিল সব মোটা সুদের মহিমায় কুমার-বাহাদুরের খপ্পরে পড়িল—এমনকি দু'একটা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মহাজনেরাও বড় শীকার ভাবিয়া উপযাচক হইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রায় দুইমাস এইরূপে অতীত হইল, ৺পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল—নায়েব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হুজুর হিসাব তৈয়ারী করিয়াছি—একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন কি? হুজুর তখন রঙে ছিলেন, বলিলেন—"দেখ বাবা বুড় ইয়ার! ও সব ফ্যাসাদে আমি নেই বাবা—তোমার আদায় ছাপিয়ে যদি খরচ বেশী হয়ে থাকে তো বল টাকা আনিয়ে দি—আর দেনা-টেনা থাকে বল যা টাকার দরকার আনিয়ে দিচ্চি—ও মাথা ঘামাতে আমি পারবো না—বুঝলে বাবা—" "আজ্ঞে আদায়ের ৫৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে আরও ৪৮ হাজার টাকা দেনা দাঁড়াচ্চে—যদি বলেন, পাওনাদারদের চোত কিস্তি অবধি থাম্‌তে বলি আদায় হলে না হয় মেটাব।" "না বাবা তা হবে না—রাজার ব্যাটা হয়ে দেনা ঘাড়ে করে যাবনা। তাহলে কাল আমূল্য কলকাতায় যাক্ আর সন্ধ্যা নাগাৎ ফিরে আসুক—৪৬ হাজার টাকার গিনি আন্‌তে বলে দিই—কি বলো?" কুমার-বাহাদুরের সেই ইঁদুরেখেকো গোঁফের নীচে মৃদু হাস্য বিকশিত হইল—সিগারেটে একটা জোর দম লাগাইয়া বলিলেন "আর দেখ তোমার পাড়াগেঁয়ের লোকেরা তো নোট পছন্দ করেন না—অত টাকা নগদ আনাবারও সুবিধা হবে না—গিনি পছন্দ করবে তো হে?" কুমারের লম্বা খরচের বহর দেখিয়া হলধর অনেক সময় শঙ্কিত হইত ভাবিত এত খরচ তহবিল হইতে করিতেছি—শেষে কর্ত্তা শুনে আমার উপর না চটেন;

কিন্তু এই প্রস্তাব শুনিয়া সে ভয় বিদূরিত হইল—মুখে হাসি দেখাদিল, সে বলিল "হুজুর গিনি হলেতো আর কথাই নেই—তা'হলে তো বেটাদের টিকি ধরে জুতো মারা হয়" বলিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। কুমার-বাহাদুর বলিলেন "কাটোয়া ষ্টেশনে ২।৪ জন বিশ্বাসী নগদী বা পাইক রেখে দেবে বুঝ্‌লে বাবা—শেষটা রাহাজানী না হয়।"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! হুজুর যে কি বলেন তার ঠিক নেই—আপনার টাকা রাহাজানী কর্ত্তে ভরসা এ জেলায় কার হবে?" "বাস্ বাস্ তুমি ভরসা দিলেই হোল—বুঝ্‌লে নায়েবজী! আর দেখ বাবা তুমি বুড়ো হলেও বেশ মার্ষ্টিডয়ার লোক—তোমায় আমি খুসী করে যাবো বাবা—তুমি যে গেলে মনে করবে মনিব ব্যাটা খালি লম্বা খরচ করে, চাকর বাকরের উপর নজর নেই—তা নয় বাবা, আমার ছাতি আছে—আমি তোমায় ৫০ খানি আন্‌কোরা গিনি দিয়ে যাব—তোমার সেবাদাসীর কণ্ঠী গড়িয়ে দিও।" "হুজুর মা-বাপ, আপনাদেরইতো খাচ্চি—তবে হুজুর আমি একা-তিনকুলে আমার কেউ নেই।" "তাকি আমার অজানা আছে সোণার চাঁদ! খাচ্চ বৈকি বেশী মাথা খাচ্চ—তাও বুঝি, তবে কি জান বাবা—আমাদের ওদিকে দৃষ্টি দিতে নেই, আর ঐ যে বল্লে কেউ নেই ওটা বাবা তোমার ছাকা দম্‌বাজী কথা; তোমার ঐ ছুক্‌রী বোষ্টুমীটা বাবা বেশ বাগিয়েছ, তোমার বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কী লাগে সোণার চাঁদ! আমি বাবা মাতাল দাঁতাল হলেও বোকা নই—জমীদারের বেটা তো, কি বলহে বুড় ইয়ার?"

বুড়ো বুঝিল এবড় কঠিন ঠাঁই—জমীদারের পুত্র সবই বুঝে এবং জানে অথচ তাহাতে তাহার নজর নেই; আর এই তো বড় লোকের নজর—তুচ্ছ জিনিষেও যদি বড় লোকে নজর দেয় তাহলে তো গরীবের প্রাণ আর বাঁচে না যাই হোক্ এমন মনিবের মন যোগাইয়া যদি দুপয়সা না কর্ত্তে পারি—তাহলে তো নায়েবী করাই বৃথা; সুতরাং মস্তক ও হস্তের সংঘর্ষণে কিছু লজ্জিত কিছু কুণ্ঠিত অথচ অপরাধ স্বীকারের মত একটা ভাবমুখে ফুটাইয়া বলিল "হুজুরের নজরে তো কিছু ছাপা থাক্‌বার যো নাই—যা কিছু কর্ত্তে পারি জান্‌বেন সে আপনাদেরই দৌলতে"—বলিয়া বলিল "তাহ'লে সংবাদটা আমি একটু সকলকে জানাইগে, কি অনুমতি করেন" "আচ্ছা বাবা যাও, আর দেখ—এই সব টাকা দেবার সময় একটা হিসেবানা কেটে নেবে সেটা তোমারই, যেটা হক্ সেটা ছেড়ো না বুঝলে বুড়ো ইয়ার" "যে আজ্ঞে—হুজুরের দয়া—হুজুরের দয়াতেই বেঁচে আছি" বলিতে বলিতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হলধর প্রস্থান করিল। এই অভিনয়টা যে অতি সুন্দর হইয়াছিল তাহা মণি মুখুজ্জে বুঝিল। সুতরাং সে পরমানন্দে একটা পুরা গ্লাস ব্রাণ্ডী ঢালিয়া এই কৃতকার্য্যতার হেল্‌থ (স্বাস্থ্য) পান করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে পায়চারী করিতে লাগিল। হঠাৎ কপাটের আড়ালে একটী আধঘোমটাটানা নারী মূর্ত্তি দেখা গেল—সে গৌরী। বেচারা গৌরী অনেক আশা ভরসা করিয়াছিল এবং তাহা সফল না হওয়ায় হলধরকে ইদানীং বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত—কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু হলধর সেই লাঞ্ছনা

গঞ্জনা নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিত—ভিতরের ব্যাপারটা যে সে অনুমান করিতে না পারিত তাহা নহে—তবে ভাবিত গৌরীরই বা দোষ কি—এ রকম আশা করাটা সত্যই তাহার পক্ষেতো অন্যায় নয়—তবে বাহাদুর ছেলে এই কুমার বটে। একদিনের জন্যও ওসব দিকে নজর নাই—নইলে একটু নজর করলে গৌরী বোষ্টুমী তো ছার—অনেক গেরস্তর বৌঝিও হয়ত বাগিয়ে ফেলত—লোকে কত নিন্দে করে, তা কলকাতায় যাই করুক বাবু এখানে কিন্তু সে রকম কিচ্ছুটী নেই—যাক্ চলে গেলে আবার সব শুধরে যাবে—সুতরাং ৫০ গিনি বক্‌শিসের খবরটা সে গৌরীকে আগে জানাইয়া গেল—ফলে হিতে বিপরীত হইল—গৌরী ভাবিল "এও মন্সের কারসাজী—ও নিশ্চয় ভিন্ গাঁ থেকে ভাল মেয়েমানুষ যোগাড় করে এনে দেয় তাই তাকে কিছুতেই ও-মুখো হতে দেয় না—নইলে কি ঘাটের মড়ার মুখ দেখে ৫০ গিনি বক্‌শিস্ দিতে চায়, এর ভেতর কথা আছে—নানা রকম ভেবে চিন্তে সে ঠিক্ করলে—বুড়ো এখন তো এই গিনি দেবার খবরটা গাঁয়ে গাঁয়ে দিতে ছুটেছে—ফিরতে রাত ৮টা নটার কম নয়—এরি মধ্যে একচাল্ চেলে দেখ্‌তে হচ্ছে—একহাত না দেখে আমি ছাড়ছি না—আর কাঁদের তো ওরা যাবে যদি এ সুযোগ ছাড়ি তা হলে এ আপশোষ আর এজন্মে মিটবে না। সাত পাঁচ ভাবিয়া সে নিজেই অভিসারে বাহির হইয়াছিল। সুরার প্রভাবে মণি মুখজ্জ্যের মাথায় তখন 'ইডেন্ গার্ডেন' বসিয়া গিয়াছিল—তার স্ফূর্ত্তির কোন রকম বাধাবন্ধন ছিল না। প্রাণটায় যেন পালক গজাইয়া উড়ু উড়ু করিতেছিল—সে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নারীকে দেখিয়া বলিল "কে গা?" "নায়েব মশাই এখানে আছেন কি—আমায় যে সন্ধ্যার সময় এখানে আসতে বলেছিলেন" "তা বেশ বেশ, তিনি এই একটু কোথায় গেছেন—আমায় বলনা কি কর্ত্তে হবে—" "আজ্ঞে না তাঁর সঙ্গেই দরকার ছিল—" বলিয়া মণ্ডপের সেই বড় লাল চোখ দুটোর ওপর বিলোল কটাক্ষের কামনাময় অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল—মনে ভাবিল এস্পার কি ওস্পার! এ আঘাত নীরবে বরদাস্ত করিবার শক্তি মণির ছিল না—সেও তাহার মুখের দিকে লালসা-স্ফুরিতনেত্রে চাহিয়া বলিল "তোমা হেন মক্কেলের সে বুড়োর কাছে কি দরকার সোণার চাঁদ—কেন আমার দ্বারা কি সে দরকার মিটবে না?" মুখ টিপিয়া হাসিয়া গৌরী বলিল "হুজুর আপনারা হোলেন বড়লোক আপনাদের নজরে কি এত গরীব লোকের দুঃখ কষ্ট পড়ে—তাহলে এতদিন কি আর পড়তো না—আমাদের যেমন বরাত তাই ঐ বুড়ো হাবড়ার কাছেই আমাদের দুঃখ জানাতে হয়" "ওঃ কি শার্প (sharp) বৈষ্ণবী তুমি একটী জুয়েল বাবা—অর্থাৎ কিনা রত্ন—এ পাড়াগেঁয়ে পড়ে মাটী হয়োনা চাঁদ চল আমাদের সঙ্গে কলকেতায় তোফা রাণীর মত পায়ের উপর পা দিয়ে থাকবে দুহাতে দুনিয়ার মজা ওড়াবে—" "সে ভাগ্য কি আমাদের হবে হুজুর" "আলবৎ হবে—ভাগ্যের বাবা হবে—বোষ্টুমী তোমায় আমি নিয়ে যাব বাবা" "দেখুন যদি গরীবকে পায়ে ঠাঁই দেন"—বলিয় গৌরী জাঁকিয়া বসিল। যখন উঠিয়া গেল তখন বিজয় গর্ব্বে তাহার বুক যেন দশহাত হইয়া গিয়াছে—আগামী পরশ বাবুর সঙ্গে সে উপস্থিত রাণীরূপে কলিকাতায় যাইবে ইহাও একরূপ স্থির হইয়া গেল। আনন্দে, হর্ষে

সে যেন আর চলিতে পারিতেছিল না—রাণী হইয়া কেমন করিয়া হাঁটিবে, বসিবে, হাসিবে, কাশিবে ইত্যাদি ভাবনায় তাহার মস্তিস্ক বিকৃত হইবার মত হইয়াছিল সুতরাং হলধরের অদৃষ্টে সে রাত্রিটা শুভ হইবে না এটা বুঝা বড় বেশী শক্ত নহে।

(৬)

পরদিন প্রাতে বাবুদের লটবহর আবার প্যাক হইয়া ষ্টীমার ঘাটে চলিয়া গেল—সেই ভারী কেস দুটী অতিকষ্টে যখন পৌছাইয়া আসিল তখন পাড়ায় বাবুদের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের কথাটা প্রশস্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য চতুষ্পাঠীর দাওয়ায় বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন হঠাৎ একটা সংবাদ পড়িয়া সর্পদষ্টের মত চমকাইয়া উঠিলেন "দুঃসংবাদ—কলিকাতাস্থ সেন রাজবংশীয় রাজা বাহাদুর গতকল্য মোটর চালাইতে চালাইতে মোটরখানি একটা টেলিগ্রাফ তারের থামে ধাক্কা লাগে—তাতে কুমার বাহাদুর বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন কুমার-বাহাদুরের এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমরা সবিশেষ দুঃখিত।" ভাবিয়া তর্করত্নের সন্ধানে বাহির হইলেন বেলা দুই তিনটার মধ্যে সংবাদটা মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল—তাহার ফলে শ্রীদাম পাল গিয়া ভজন বৈরাগীর গৃহে নায়েবের সন্ধানে হাজির হইল। হলধর তখন সবে-মাত্র আহারাদি সমাপ্ত করিয়া তাম্রকুট সেবায় মনঃসংযোগ করিয়াছে—এমন সময় শ্রীদামের ব্যগ্র চীৎকারে বাহিরে আসিয়া বলিল—"কি হয়েছে পালের পো! দুপুর বেলা এই হাঁকাহাঁকি কিসের হে?" "দোহাই নায়েব মশাই আপনি রক্ষা করুন নইলে গরীব মারা যায়" বলিয়া রোরুদ্যমান নেত্রে তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিল। নায়েব তো হতবুদ্ধি—কি যে ব্যাপার তাহা জানিতে চাহিলে অনেক অবান্তর কথার ও অজস্র ক্রন্দনের সৃজন করিয়া পালের পো এক কাণ্ড বাধাইয়া বসে—তাহাকে অতিকষ্টে প্রবোধ দিয়া নায়েব বলিল" তুমি খেপেছ ছিদাম, আমি সদর থেকে চিঠি পেয়েছি—আর আমি কুমার-বাহাদুরকে চিনি না—আর তোমাদের যেমন বিদ্যা—কাগজে যার কথা দেখেছ তিনি হচ্ছেন বড় কুমার বাহাদুর—যাও যাও বেলা হয়েছে গিয়ে চান্ টান্ করে খাওয়া দাওয়া করগে· আর এসব কথা যদি কুমারের কাণে উঠে তো কাল টাকা দেবার সময় কি কাণ্ড হয় দেখো। শ্রীদাম সুবুদ্ধির মত কথাটা বুঝিল—নায়েব ভাবিল বাবুগেলে একবার শ্রীধর ভট্চাজকে মজা দেখাতে হবে এটা করার মানে আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধা—আচ্ছা—তুমি কত বড় পুরুৎ বামুন—আর আমিও পূর্ণ হালদারের বেটা দেখে নেব কে জিতে!

সংবাদপত্রের খবরটা মণি মুখুজ্জ্যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাই প্রাতে যখন অমূল্য মোটরে করিয়া কলিকাতায় গেল—তাহাকে হাওড়া হইতে একটা তার করিয়া দিয়া যাইতে বলিয়া দিয়া-ছিলেন। সন্ধ্যার পর যখন লোচনমণ্ডল তার ডেলিভারী দিতে আসিল—তখন পাল ও হলধর উভয়ে চণ্ডীমণ্ডপের রকে বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছে—নায়েব বলিল কিহে লোচন—আজ্ঞে

একটা 'তার'—'তার' কার নামে তারের নাম শুনিয়াই দুজনে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু লোচন যখন বলিল "কুমার বাহাদুরের তার" তখন এ ওর মুখের দিকে চাহিল—অর্থাৎ একজন যে অপরকে কি বলিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। নায়েব মহাশয় টেলিগ্রামখানা ভিতরে কুমার বাহাদুরের নিকট লইয়া গেলেন—ভিতরে একটা শতরঞ্চির উপর একটা মোটা তাকিয়ার উপর কুমার-বাহাদুর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিলেন—তার খানা লইয়া একটা হিজিবিজি সই করিয়া দিয়া ঠক্ করিয়া একটা টাকা ছুড়িয়া পিয়নকে বক্‌শিস দিতে বলিলেন—নায়েব টাকাটী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল—তবে টাকাটা যে ভুলক্রমে তাঁহারই ট্যাকেরইয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না—কারণ লোচন বকসীসের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। টেলিগ্রাম পড়িয়াই মুখখানা খুব বিকৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন "বড় বড় ইয়ার বড় মুস্কিল" "আজ্ঞে হুজুর কি মুস্কিল হল আবার" শ্রীদামের মুখ একেবারে শুখাইয়া যাইতেছিল— কুমার বাহাদুর বলিলেন "বাবা তার করেছেন—দাদা মোটরে ধাক লেগে বড় জখম হয়ে পড়েছেন—আর আমার এখানে থাকা চলবে না—কাল অমলা আজ গেছে, টাকাটা নিয়ে কাল সব মিটিয়েটিটিয়ে দুপুর বেলাই রওনা হতে হবে—আর দেরী করলে চলবে না—"কথাটা শুনিয়া শ্রীদাম আশ্বস্ত হইল—কারণ বন্দের পত্র-স্বরূপ সতের হাজার টাকা—টাকা প্রতি দুই পয়সা সুদে ধার দিয়া বসিয়াছিল—সে নায়েবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে কুমার-বাহাদুর বলিলেন "ওটী কে হে?" "আজ্ঞে গাঁয়ের মুদি ছিদাম পাল, বেশ পয়সাওলা লোক—ও হুজুরের জন্য সতের হাজার টাকা দিয়েছে—" "বটে—তাই তাগাদায় এসেছিল নাকি?" "আজ্ঞে না হুজুর তাও কি সম্ভব, আপনার কাছে তাগাদায় আসবে আমি থাকতে—ও এসেছিল একটা জমীর বন্দোবস্ত কর্ত্তে তা বেটা ছেঁচড়া কিনা সেলামী আড়াইশ টাকা দিতে চায় না—" "খবরদার বিনা সেলামীতে যেন জমা দিও না।" বলিয়া কুমার-বাহাদুর অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বৌরাণী ওরফে সুখদা তখন দালানে বসিয়া পান সাজিতেছিল কুমার বাহাদুর এদিক ওদিক চাহিয়া অন্য কেহ নাই দেখিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন "সুখ" আর কেন বাবা এইবার জাল গুটাও কাল রওনা হতে হচ্চে।" "কেন এত তাড়াতাড়ি—কিছু বাধা পড়ল নাকি?" "ঠিক বাধা পড়ে নাই বটে তবে পড় পড়, কি জান বাবা শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন হতে কতক্ষণ যাহোক এখানে এসে প্রায় লাখ্ দুই টাকার কাজ হোল" "এবারে কিন্তু বাবু আমায় কাশীতে একখান বাড়ী আর দশটী হাজার নগদ দিতে হবে—" "ইস্! তাইতো ধর্ম্মে হঠাৎ এত মতি হল কি করে বাবা—কলকেতা চলিয়ে এসে ন'দে মজাতে—আবার নদে মজিয়ে কি শেষে কাশীও ভাসাবে নাকি!" 'তোমার যেমন নোংরা মন তাই অমন সব কথা—আর বয়স হল, চিরকালই কি এই রকম করে কাটাব—এইবার একটু পরকালের চিন্তা করবো না?" "ঠিক—ঠিক বলেছ সোণার চাঁদ—বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী হবে কিন্তু পারবে কি? বয়েস হয়েছে তা বটে কিন্তু এখনও রক্ত মাংসের খিদে রয়েছে যে, সেখানে গিয়ে পুণ্যি কর্ত্তে কর্ত্তে আবার হয়তো শীকার গেঁথে বসবে।"

"যাও যাও আর চালাকী কর্ত্তে হবে না—সে বটে তোমার, কিছুতেই আশা মেটে না মরবার আগে পর্য্যন্ত পাপ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্বে।" "ছিঃ মণি অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে—শত্তুর মরুক্ আমি কেন মর্ত্তে যাব? আর বাবা এত লোকের সর্ব্বনাশ করে দু এক বছর কাশী বাস করে যদি তুমি স্বর্গে জায়গা পাওতো আমারও একটু জায়গা সেখানে জুটবে—" "আচ্ছা বাবু তাই তাই, তোমার সঙ্গে কথায় তো পারবার যো নাই—" "আর দেখ সেই বোষ্টমী ছুঁড়িটাকে দেখেছ তো—সেটাকে বাগিয়েছি মনে করেছি সেটাকে নিয়ে যাব—কি বল?" "যাবে বৈকি আমার সর্ব্বনাশ করেছ তাকে কি আর ছেড়ে দেবে, মেয়েমানুষ অবলা বলেই তাদের উপর এত অত্যাচার করতে ভরসা কর।" "হ্যাঁগো তর্কচূড়ামণি। মেয়েমানুষ যা অবলা তা আর কথায় কাজ কি? দেখ বাবা একটা সোজা কথা বলে রাখি—মেয়েমানুষ যদি নিজে খারাপ না হয় তবে তাকে খারাপ করা কোন পুরুষের সাধ্য নয়।" "তাকে তো নিয়ে যাবে, তারপর আমার উপায় কি হবে—" "এরি মধ্যে হিংসে কেন? তোমার ভাগ তো সে কেড়ে খাবে না, তুমি যা বলবে তাই হবে—তবে সে আমার খাসতালুক হবে বুঝলে।" "বুঝেছি আমি বুড়োহাবড়া আমার আর কি আছে বল—তাই তার উপর এখন টাঁক। কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে এখনতো হেনস্থা কর্ব্বেই—" "এই মন নিয়ে তুমি কাশী যেতে চেয়েছিলে প্রাণ! গোড়ায় তো বলেছি যে ক্ষিদে না মরলে অরুচি হয় না—তা তোমার কোন ভাবনা নাই অমলচাঁদ তোমার তত্ত্বাবধারণ কর্ব্বেন।" কথাটায় সুখদা মনে মনে খুসী হইল—কারণ দলের মধ্যে মণি খুব ছোক্‌রা হলেও সে বড় খামখেয়ালী তাহার মন যুগিয়ে বরাবর চলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়—তার চেয়ে অমূল্য এক হিসাবে ভাল কারণ সে বুঝে শুঝে চলে—আর যা কিছু করে সব হিসেব করেই করে। সেজন্য সুখদা মনে মনে অমূল্যর প্রতি আসক্তা ছিল—এমন কি যদি মা কালী মুখ তুলে চান তবে এই মানুষটাকে মনের মানুষ করিয়া। সে এই আধা বয়সে ঘর সংসার পাতিতেও অভিলাষিণী ছিল। তাই মুখে বলিল "তোমাদের যা ইচ্ছে করো বাবু আমাকে ওসব হাঙ্গামে জড়াও কেন—যা কর্ত্তে হবে বলো কর্ব্বো—ওসব কথায় আমি নেই।" কুমার-বাহাদুর "অল্ রাইট্—এই তো হলো মাইডিয়ারের মত কথা" বলিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে গেল।

চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিল প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর সেই স্তিমিত দীপালোককে ম্লান করিয়া রূপপ্রভা-সমুজ্জলা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী গৌরী বসিয়া আছে। তাহার চক্ষে কামনাময় তীব্রোজ্জ্বল কটাক্ষ—অধরে বাসনাবহ্নি প্রজ্জ্বলনকারী মৃদুমন্দ হাস্য, মুখের ভাবে যেন জন্ম-জন্মান্তরের আকুল কামনা ঝড়িয়া পড়িতেছে "এতক্ষণ বুঝি গিন্নীর সঙ্গে রসালাপ হচ্ছিল" "কি করি বল ভাই বন্ধুটী কলকেতায় গেছে একা বসে বসে ভাল লাগে না আর তোমারও দেখা পাবার যো নাই।" "কি করে আসি বলুন একটু গা ঢাকা না হলে তো আর আসবার যো নাই—কেউ যদি দেখে তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে—আমরা গরীব না হয় কলঙ্কের বোঝা বইতে পারি—কিন্তু আপনাদের নামে কেউ একটা ছোট কথা বলবে—সেটা কি করে সহ্য কর্ব্ব বলুন।" "মাইরি তোমার মতন

বুঝি বড় বড় ঘরের মেয়েদেরও দেখা যায় না—আচ্ছা চল তুমি কলকেতায় তারপর দেখাব যে পিরীত কি করে কর্ত্তে হয়—" "তাহলে কাল ভোরে আমি মামার বাড়ী যাবার নাম করে গরুর গাড়ী করে বেরিয়ে কাটোয়ায় গিয়ে ষ্টেশনে মেয়ে-কামরায় বসে থাকব, এই কথাই ঠিক রইলো তো" "তার আর ভুল আছে মণি—কিন্তু দেখো ষ্টেশনে গিয়ে যদি না দেখতে পাই—তা হলে কিন্তু ভাল হবে না" "আমার কথার খেলাপ পাবেন না—যখন সর্ব্বস্বই আপনার পায়ে সঁপে দিয়েছি—তখন আর কি বাকী বলুন না" "দেখো ভাই, ও সব আপনি-মশাই গুলো আর বলোনা—আমি যাই হই—তোমায় যে চক্ষে দেখেছি মণি তা আর কি বল্‌বো" "বৌরাণী রাগ কর্ব্বেন না তো?" "করেন আমার বাবার ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন—আমি বাবা সে হাড়ের বোঝার তোয়াক্কা রাখিনা—বুঝ্‌লে—আমি হচ্চি ভোম্‌রা, "অলি ফুলে ফুলে ঘুরে বসে—তবে তো ফুল বিকাশে"—বলিয়া সুর ধরিলেন গোরা বুঝিল বাবু এখন রঙে আছেন—তাই সে বলিল "কিন্তু দেখবেন সেখানে গিয়ে আবার অন্যফুলে বসে না পায়ে ঠেলেন—আমার কিন্তু তাহলে আর আর উপায় থাকবে না—কালামুখ নিয়ে এদেশে তো আর ফিরতে পারবো না" "কি যে বল মাই ডিয়ার তার ঠিক নেই—সাগর ছেঁচে মাণিক নিয়ে যাব কি হারাব বলে"? "আপনি থুড়ি তুমি ভাই কথাতেই আমায় মজিয়েছ" "আর তুমি—তুমি আমায় মজিয়েছ ঐ চোখদুটীতে," "পাগল করেছ প্রাণ আঁখিতে প্রাণ মেরে" "থাক্‌গে থাক্‌ অত আর সোহাগ করতে হবে না, যাই হোক্‌ মনে থাকলেই হলো" "সে ভয় করোনা ধনি তোমার ঐ চক্‌ চকে, ঝক্‌ ঝকে চোখদুটী থাকতে তোমায় ভোলে কোন্‌ শালা—এখন মনে করি এতদিন জমীদারী দেখতে কেন আসিনি" "ঈস্‌ -এতটান্‌ থাক্‌লে বাঁচি" "দেখো, থাকে কিনা" "আচ্ছা এখন তা হলে উঠি রাত হোয়ে যাচ্ছে" "সেকি একটু মিষ্টি মুখ করে যাবে না!" বলিয়া গ্লাসে একগ্লাস ব্রাণ্ডী ঢালিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল—গন্ধের ঝাঁজে মুখটা সরাইয়া লইয়া বলিল "না বাবু ওসব ছাই ভস্ম আমি খেতে পারবো না" "আরে তাই কি হয় চাঁদ—এই হল মূলাধারা এ নাহলে কি পিরীত জন্মায়—অমন করে মুখ বেঁকিও না খাও এ হচ্চে তোমার সাধনতন্ত্রের কারণ একটু ঝাঁজ বটে কিন্তু তাতে কি! ঐ ঝাঁজটুকুকে একবার কায়দা কর্ত্তে পারলেই দেখবি কত মজা, মাথার ভেতর সাত সাগরের ফুর্ত্তি যেন ভিন্‌ ভিন্‌ করবে বুঝলি" বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই তাহার গলায় খানিকটা ঢালিয়া দিল—সে খানিকটা খাইল খানিকটা থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু যেটুকু তাহার পেটে গিয়াছিল তাহার প্রভাবে গোরা অচিরে দিব্যদৃষ্টি পাইল—সেই ভাবানুরঞ্জিত-নেত্রে সে দেখিল সে কলকাতায় গিয়া সত্য সত্যই রাণী হইয়াছে—প্রকাণ্ড একটা বাগানবাড়ীতে সে আছে, লোকজন চাকর-দাসীতে তাহার বাড়ীখানা ভরা এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে গহনা, সোণারূপা হীরা মতিতে তাহার অঙ্গ আবৃত। সে কুমারের হাতখানা ধরিয়া বলিল "বাবু এত সুখ কি আমার অদৃষ্টে সইবে সইবে বৌকি চাঁদ— তবে ক্রমে ক্রমে নইলে বরদাস্ত কর্ত্তে পারবে না—" বলিয়া গোপাল মদিরারক্ত রাগরঞ্জিত

প্রফুল্লঅধরে চুম্বন করিল—সে স্পর্শে গৌরী শিহরিয়া উঠিল গৌরী মরিল; সে মজাইতে আসিয়া মজিল। শীকার করিতে আসিয়া সে নিজেই শীকার হইল—তাহার আর পলাইবার পথ রহিল না। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু—এই সনাতন নীতির লঙ্ঘন হইল না—হতভাগিনী গৌরীর জন্য জগতের সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

(চ)

অমূল্য যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। দ্বিপ্রহরের সময় দস্তুরমত জমীদারী কায়দায় বসিয়া কুমার-বাহাদুর উত্তমর্ণদিগকে প্রাপ্য চুকাইতে লাগিলেন—তাহারা রূপার বদলে কড়কড়ে গিনি পাইয়া পরম সন্তোষে ঘরে ফিরিল—সমস্ত দেনা মিটাইবার পর ৫০ খানি ঝকঝকে গিনি হলধর পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মাদ হইবার মত হইল এবং মনে মনে গৌরীর কমকণ্ঠে এই দীপ্ত প্রভাময় গিনি গুলি মাল্যাকারে কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিবে—তাহাই তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল—কারণ গৌরী যে মামার বাড়ীর নাম করিয়া পগার পার' হইয়াছে—তাহা প্রেমবিহ্বল বৃদ্ধ জানিত না—সকলে বিদায় গ্রহণ কালিন কুমার-বাহাদুরের জয় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কুমার-বাহাদুরের প্রস্থানের আন্দাজ ৫ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—পল্লীর ভবনে ভবনে মঙ্গলশঙ্খনিনাদ উত্থিত হইতেছে—পাখীগুলি যখন ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ বুজিয়া রাত্রিতে শান্তিলাভ কামনায় বসিয়াছে—যখন তুলসীতলায় দীপ দেখাইয়া কুলবধূগণ রোরুদ্যমান শিশুদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে সেই সময় একজন বেঁটে মোটা লোক মস্ত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া একটা লাঠী ঠুকিতে ঠুকিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এটা কি রাজা-বাহাদুরের কাছারী? চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হলধর বসিয়া তখন কুমার-বাহাদুরের পরিত্যক্ত খালি ব্রাণ্ডীর বোতলগুলা জড় করিতেছিল—এবং মনে মনে ৵০ আনা হিসাবে একটার দাম হইলে ১৬টা বোতলের কত দাম পাওয়া যাইবে তাহা একটা মোটামুটি খতাইয়া দেখিতেছিল—সে তখন স্বভাবসিদ্ধ কর্কশকণ্ঠে বলিল "ভর সন্ধেবেলা দুটো ঠাকুর দেবতার নাম করবো তারও যো নাই—আবার এক আপদ হাজির! তুমি কে হে বাবু?" আপদটী তখন রোয়াকে ব্যাগ নামাইয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন "আপনার নামই কি হলধর বাবু—আপনি কি রাজ-এষ্টেটের নায়েব? "যদিই হই তাতে তোমার কি হে—এখানে যায়গা টায়গা হবেনা—"সে মনে মনে ভাবিতেছিল আজ গৌরীকে গিনির তোড়া দেখাইয়া তাহার মনটা আর্দ্র ও আয়ত্ত করিয়া দুটা চণ্ডীদাসের পদ শুনিবে—ও গত দুই মাসের বিরহের জ্বালা শীতল করিবে কাজেই এই অনাহুতের আগমনে সে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। আগন্তুক তাহাতে টলিবার পাত্র নহেন—তিনি পকেট হইতে একটা মোটা বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার আগাটী বেশ সমভাবে ধরিয়াছিল কিনা তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার না যাইবার গা

চরণ-রঞ্জনরত

যেমন আছ তেমনি এস আর করোনা সাজ

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

দেখিয়া হলধর বলিলেন "বলি মশাই কি কাণে কম শোনেন—এই তো বললুম যে এটা সরকারী খাজনাখানা—এটা অতিথ্শালা নয়"। চুরুট হইতে প্রবলবেগে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে তিনি বলিলেন" বাবু হে তোমার হুম্কীতে ভয় খাইবার পাত্র আমি নই—আমি ডিটেক্টীভ কালীশঙ্কর রায়—কলিকাতা হইতে আসিতেছি- তোমার এখানে কি দুটি ছোক্‌রা একটী স্ত্রীলোকও দুটি চাকর সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল ?—ডিটেক্‌টিভ শুনিয়া হলধর একটু শঙ্কিত হইল কারণ স্থানীয় থানায় রজতচক্রের প্রভাবে তাহার প্রতিপত্তি থাকিলেও কলিকাতার গোয়েন্দা-দের সে বড় ভয় করিত—কারণ তাহারা না পারে এমন কাজ নাই- অন্ততঃ ভাল করিতে না পারুক মন্দ করিতে যে তাহারা সিদ্ধহস্ত ও অপূর্ব্ব শক্তিশালী—ইহা সে বিলক্ষণ জানিত; সুতরাং সে বলিল্ "আমাদের কুমার বাহাদুর ও তাহার বন্ধু. রাণী ও একজন বামুন এসেছিলেন—তাঁহারা আজ সকালে বেলা ১১টার সময় রওনা হয়ে গেছেন। "বটে! তাহলে আমায় এখনি উঠ্‌তে হল - তবে একটা সংবাদ তোমায় দিয়ে যাই—তারা আসলে সে সব কিছুই নয়—তারা হচ্চে দু জন প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ—তারা অজস্র গিনি জাল করে বাজারে চালাচ্ছে—তাদের ধরবার জন্যই আমি এসেছিলুম—আবার এখুনি ছুটতে হল দেখতে হবে তারা গেল কোথায় - " "বলেন কি গিনি জাল করে ? বলেন কি" বলিয়া সে মূর্চ্ছা যাইবার মত হইল—গোয়েন্দাপ্রবর হাসিয়া বলিলেন "কেন, এ অঞ্চ পাড়াগেঁয়েতে ও গিনিটিনি ছড়িয়ে গেছে না কি ?" "মশাই জমীদারীর আদায় বাবদ ছাপান্ন হাজার টাকা দিয়েছি—গ্রামথেকে ছেচল্লিশ হাজার টাকা ধার করিয়ে দিয়েছি—সেই ছেচল্লিশ হাজার টাকা যে খালি গিনিতে পেমেণ্টো করে গেছে—কি হবে—হুজুর আমাকে বাচান—নইলে রাজা বাহাদুর তো আমায় জেলে দেবেন—আর গাঁয়ের লোক যারা নিশ্চিন্ত হয়ে গিনি নিয়ে গেছে—তারা টের পেলে আমায় খোড়্কাঁচ করবে। আমার কি হবে হুজুর"—"বল কিহে—তারা এখানে যে এতটা কত্তে সাহস কর্ল্লে—তা আশ্চর্য্য মাথায় আসেনি--উঃ কি শয়তান এই মণি মুখুজ্জ্যে ! যাই হোক বাপু আমি এখন তাদের সন্ধানে যাচ্ছি, ফিরতে পারব কি না তা জানিনে—যদি পারি ভালই নইলে তুমি এইটে নিয়ে কালীগঞ্জের থানায় গিয়ে সব বলগে, তারা যা হয় করবে—আমি চল্লুম" বলিয়া ব্যাগটী তুলিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল হতবুদ্ধি হলধর ছুটিয়া গিয়া গিনিগুলি বাহির করিয়া মেঝেতে ছুড়িয়া ফেলিল—সেগুলি ট্যাব ট্যাব করিয়া বোদা আওয়াজ করিয়া যেন তাহাকে বিকট উপহাস করিল। হলধর মনে মনে একটা কন্দী আঁটিল। সে ছুটিয় ভজনের কটীরে গিয়া দেখিল ভজন দুই হস্তে গাঁজার কলিকা ধরিয়া পরমানন্দে অরিতানন্দের সেবা করিতেছে সে বলিল "খুড়ো গৌরী কোথায় ?" "আর বাবা গৌরী কি সে গৌরী আছে ! সে ভোরে উঠে মামার বাড়ী যাই বলে নিধু মোড়লের গাড়ীতে গেছে। এখন গাড়ী ফিরি এলে নিধু বলে গেল যে কাটোয়া ষ্টেশনে গেছে—বোধ হয় বা তোমার কুমার বাহাদুরের সঙ্গ নিয়েছে—

সোমত্ত মেয়ে সে কি আর বুড়ো বাপের মুখ চেয়ে থাকবে—সে বাবা নিজের পথ দেখেছে।" অন্ধকারের মাঝে বিদ্যুত বিকাশ হইলে সেই এক ঝলক আলোকে পথভ্রান্ত পথিক যেমন তাহার গন্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়—হলধরও সেইরূপ একটা কিছু মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়া সেই গাঢ় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে শ্রীদাম গিনি রহস্য অবগত হইয়া যখন হলধরকে আক্রমণ করিতে বীরবিক্রমে আসিল—তখন সে দেখিল চণ্ডীমণ্ডপের দ্বার মুক্ত এবং মেঝে ময় গিনি ছড়ান—হলধরের অস্তিত্ব চিহ্ন কোথাও বিদ্যমান নাই।

কয়েকদিন পরে একখানি সংবাদপত্রে নবীগঞ্জবাসীগণ পাঠ করিল "দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা—" রাজা প্রমোদকিশোর সেন বাহাদুরের নবীগঞ্জের নায়েব আদায়ী ৫৬ হাজার টাকা ও উক্তগ্রামবাসীগণের ছেচল্লিশ হাজার টাকা দুইজন চতুর সহকারীর সাহায্যে অপহরণ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে—স্থানীয় পুলিশ বহু অনুসন্ধানেও কোন কিনারা করিতে পারে নাই তবে চতুর্দ্দিকে থানায় থানায় হুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে আসামীগণ শীঘ্রই ধরা পড়িবে।
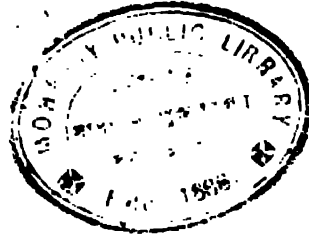
নূতন জীবন।

(১)

স্বরেন আসিয়া নিখিলকে বলিল "ওহে চালগুলো বদলে ফেল, এ রকম চালে চললে আর চলবে না।"

নিখিল বিস্মিতভাবে মুখ হইতে সিগারটা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কারণ?"

স্বরেন বলিল—কারণ ঢের। তুমি তো বাইরের—অর্থাৎ দেশের কোনও খবর রাখ না। তোমার নিজের কাজ কোর্টে, আর কয়েকটী বন্ধু—তারাও ইউরোপিয়ান, আর স্ত্রী, এই নিয়েই আছ। দয়া করে—নেহাৎ নাকি মাতৃভাসাটা ব্যবহার করে বাঙ্গলাকে শুধু কৃতার্থ করবার জন্যেই একমাত্র বাঙ্গালীবন্ধু রেখেছ আমাকে। এটা যে আমার কতদূর সৌভাগ্য তা—

নিখিল তাহাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল সেসব কথা ছাড়ান দাও। তোমার মত বন্ধু যে আমার আর কেউ নেই তা আমি বেশ জানি, আসল কথাটা কি তাই বল।

স্বরেন বলিল আসল কথা তুমি যে ভারতীয় ইংরেজ নও সেইটে মনে করে রাখ। বিদেশীয় আচার ব্যবহার গুলো—যা অনেক কষ্টে আয়ত্ত এনেছ, সে গুলো একেবারে ত্যাগ করতে হবে।"

নিখিল চিন্তিতমুখে সিগার টানিতে টানিতে বলিল "কথাটা যেন নতুন রকম বলে মনে ঠেকছে।"

স্বরেন বলিল তাতো ঠেকবেই। শুধু তোমার বলে নয়, অনেকেরই কাছে কথাটা নতুন বলে ঠেকেছে, এখনও ঠেকছে, এর পর ঠেকবেও। এতে অনেক চঞ্চলও হয়ে উঠবে। নদীর স্রোত একটানা যে দিকে বয়ে চলেছে, বিপরীত দিক হতে ধাক্কা এসে লাগলেই সে স্রোতটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে না কোন দিকে এখন চলবে সে। তোমাদেরও হবে তাই, কেননা যে দিকে চলেছ—বিপরীত দিক হতে ঠাক্কা লাগলেই চঞ্চল হয়ে উঠবে।

নিখিল বলিল "কবি মশাই একটু খানি থাম। আমায় বুঝিয়ে দাও ব্যাপারখানা কি। নদীর স্রোতের সঙ্গে আমার মনের কমপেয়ার তো করে গেলে বেশ, কিন্তু কেন যে করা হল, তা মোটেই বুঝতে পারলুম না।

স্নরেন বলিল তাই তো আগেই বলেছি দেশের ছেলে হয়ে দেশের খবর না রাখলে এই রকমই হয়ে থাকে। তোমার যাওয়ার স্থান ইউরোপীয়ান ক্লাব, অর্থাৎ তাদের বুঝাতে চাও তুমি ভারতীয় হলেও ভারতীয়দের তুমি ঘৃণা কর। তোমাদের মত অপদার্থ লোকেই আমাদের এত নীচু করে ফেলেছে। এতে যেন রাগ কোর না ভাই, যা সত্য আমি তাই শুধু বলে যাচ্ছি! তোমরাই তাদের এতটা গর্ব্বিত হতে দেও; তারা এখন আমাদের পানে কুকুরের পানে যেমন লোকে হেলার চোখে চায় - তেমনি তাকায়, এটা ভাব না তারা তোমার সামনে তোমার খুব প্রশংসা করে, কিন্তু তাদের চোখে খেলে যায় ঘৃণার তরঙ্গ, মুখে ভেসে ওঠে ঘৃণার হাসি। সত্য বল—দেখি তারা কি তোমায় তাদের সমান ভাবে, দেখে?"

নিখিল একটু নীরব থাকিয়া বলিল "তুমি কিন্তু বরাবরই এই কথা বলে আসছ।"

স্নরেন বলিল "বলচি তোমায় মানুষ করবার জন্যে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে কর্ত্তব্য আমি শুধু সেইটেই করে যাই। তুমি কিন্তু আমার একটা কথাতেও কোনও দিন কাণ দাওনি, বরাবর হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছ। বুঝতে পারছ না ওদের ঘৃণা, বুঝতে পারছ না ওদের কথা। সামান্য একটু প্রশংসা করে ওরা আমাদের দিয়ে কি-না করিয়ে নিচ্ছে! শাদা মুখের একটা থ্যাঙ্ক পাবার জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি এমনি অধম নীচ জাত আমরা। আমরা নিজের ঘরের পানে চাইনি, দেখি নি সেখানে কিছু আছে কিনা, হাহাকার করে ছুটেছি মরীচিকার পেছনে, কিন্তু পেয়েছি কেবল জ্বালা। এই ভুল বুঝতে পেরে সারা জগৎ আজ জাগার সাড়া দেছে। তোমার ছদ্মবেশীর পোষাক ফেলে—গোপনতার আড়াল ভেঙ্গে একটু বাইরে এসো, দেখো কি পুলকহিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। দলে দলে ছেলে বুড়ো ছুটেছে, কোথায়—জানো?"

নিখিল মুখ ফিরাইয়া বলিল "একটু জানি।"

স্নরেন বলিল "সবটা জানতে চাওনি কেন বন্ধু? তুমিও কেন ছুটছ না ওদের সঙ্গে? তোমারই ভাই ওরা, ওরা এগিয়ে যাবে তুমি থাকবে পেছিয়ে, কেন? অমৃত-হ্রদে স্নান করে অমর হতে পিছু-পা হচ্ছো কেন তবে? এক জায়গাতেই তবু পড়ে থাকতে চাও—নিজেকে নিজে চিনতে পেরেও?

নিখিল গম্ভীরভাবে বলিল "ধীরে বন্ধু—ধীরে। ভেব না আমিও উদাসীন, আমার প্রাণও উত্তেজিত হয়ে ওঠেনি! আজও আমি ইউরোপীয়ান ক্লাবে যাই, ওদের ডিনার দেই, ওদের সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু সে রকম অসঙ্কোচে আর পারি নে। মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ মচ করচে, তবুও যতক্ষণ না ঠিক প্রমাণ পাই ততক্ষণ স্পষ্ট জবাব দিতে পারছি নে।"

স্নরেন বলিল "আর প্রমাণ চাই? আমার মনে হচ্ছে বিলাসিতা চালাবার জন্যেই এখনও ইতঃস্তত তোমার। এই হরদম প্যাণ্ট হ্যাট, এই সিগার মুখে, ওদের ফ্যাসানে ডুবার চা, আর—

নিখিল তাহার গা চাপড়াইয়া বলিল "ছাড়তে কতক্ষণ বন্ধু? অভ্যাসটা ছাড়তে দেরী

হবে না কারণ এ আমার ধার করা জিনিস নয়। নিজের ঘরের কাজ আমি ভুলি নি, দরকার হলেই তা আবার করব।"

সুরেন বলিল "দরকার তো এসেছে তবে নিশ্চেষ্ট কেন?"

নিখিল অন্যমনস্ক হইয়া বলিল "কেন? কেন তাতো বললুম। যখন প্রাণে একটা স্রোতের হিল্লোল অনুভব করেছি বন্ধু, তখন সে হিল্লোল সব উলট-পালট করে দেবেই।"

---

(২)

বড় বিলাসিনী ছিল কমলা। সে বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের স্ত্রী। আজন্ম বিলাসের ক্রোড়েই সে লালিতাপালিতা। নিখিল নিজে জমীদার এবং ব্যারিষ্টার। বাড়ীতে বয়, বিলাতী বাতাস—দেশীর সেখানে নাম গন্ধ ও ছিল না।

কমলা স্বামীর চেয়েও গর্ব্বিতা ছিল বেশী। নিখিলের দেশীয়বন্ধুদের সে দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিত না। বিলাতীর হাওয়াও যথার্থ তাহার প্রাণের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল বটে। সুরেন সাহস করিয়া এই অতিরিক্তশিক্ষিতা পত্নীর নিকটে যাইতে পারিত না, সে এমনভাবে নাসা কুঞ্চিত করিত যে সুরেন ভয় পাইয়া যাইত, পাছে তাহার মোটা কাপড় জামা দেখিয়া, কমলার ফিট হয়।

কমলা কতদিন নিখিলকে এই তৈলাসক্তমস্তক ধুতি-চাদরধারী বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, ভয়ও দেখাইয়াছিল এইরূপ বন্ধুর সহিত মিশিলে ইউরোপিয়ান সমাজে মুখ থাকিবে না। পত্নীর আর সব কথা নিখিল শুনিত কিন্তু বন্ধুকে ত্যাগ করিবার কথা শুনিলেই সে গম্ভীর হইয়া সরিয়া পড়িত। কমলার সকল শক্তি এইখানেই ব্যর্থ হইয়া যাইত।

সে ইউরোপিয়ান সমাজে মিশিয়া প্রাণপণে তাহাদের আচারব্যবহার অনুকরণ করিয়াও ভুলিতে পারে নাই সে বাঙ্গালীর ছেলে, ধুতি চাদরই তাহার জাতীয় পোষাক। সেও ছোটবেলা হইতে বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধুতি চাদর পরিয়াই দিন কাটাইয়াছে। আজই না হয় সে প্যান্টকোট পরে, গায়ে সাবান, এসেন্স অটো মাখে, কিন্তু চিরকাল তো এরূপ ছিল না।

সেদিন নিখিল যখন কোর্ট হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—শুনেছ কমলা, দেশের অবস্থাটা কি?"

তখন কমলা স্পষ্টই জবাব দিল "দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি যে খবর রাখতে যাব?"

উত্তর শুনিয়া নিখিল থতমত খাইয়া গেল। অবাক হইয়া সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া কমলা বলিল "অমন করে চেয়ে রইলে যে?"

নিখিল বলিল "তোমার কথা শুনে।"

কমলা বলিল "আমার কথা কি?"

নিখিল বলিল "দেশের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি ভাবছি কমলা, তুমি একটুও না ভেবে কেমন ফস্ করে বলে ফেললে দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি? এ কথা কি হতে পারে যে দেশের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই? দেশের বুকে কি আমরা নেই, দেশের জিনিস আমরা কি ব্যবহার করছিনে, দেশের খাবার, দেশের জল আমরা কি খাচ্ছি নে? দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতিনিয়ত; আমাদের দেহ, আমাদের মন, দেশের সঙ্গে বিজড়িত; এ সত্বেও তুমি ওই মুখে কেমন করে বলছ কমলা—দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?"

কমলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহারপর বলিল—তা থাকতে পারে, কিন্তু—

নিখিল বলিল "আবার কিন্তু কেন? তবে বলতে চাও তুমি, দেশের কোনও লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই তোমার? কিন্তু বোঝ কমলা—দেশের লোক নিয়েই দেশ, দেশ বলতে আলাদা কিছুই বুঝায় না। দেশের লোক তোমার ঘৃণাই উৎপাদন করে কমলা, কিন্তু এটা বুঝে দেখ না এরাই তোমার আবশ্যক বহন করে। এরা না এগিয়ে দিলে আমরা কিছু খেতেও পেতুম না, পরতেও পেতুম না। যারা প্রাণপণে খেটে আমাদের অভাব মোচন করছে, কেন তারা তোমার এত ঘৃণাভাজন কমলা?"

উষ্ণ হইয়া কমলা বলিল—তোমার ইচ্ছে এই সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, স্পষ্ট তাই বল! তবে এতদিন এ মুখোস পরেছিলে কেন জিজ্ঞাসা করি?"

নিখিল শান্তভাবে বলিল "বুঝতে পারি নি, জানতে পারি নি তাই। লোকে—আপাতঃ মধুর যেটা সেইটেই আগে গ্রহণ করে, কারণ সেটা দেখতে বড় উজ্জ্বল, বড় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাতে যে কতখানি দাহিকাশক্তি আছে তা তারা তখন ভাবে না। যথার্থ ভাল যা—একদৃষ্টি দেখে, চিনে কয়জন লোকে তা গ্রহণ করে? আমিও মূর্খের দলের একজন, তাই দেশীকে অবহেলা করে বিলাতীর আদর করেছি, দেশকে চিরকাল অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছি। দেশ বলতে বুঝেছি তোমারই মত কাদা আর মাটী, এর যে প্রাণ আছে, এও যে আঘাত পেয়ে দমে পড়ে, আনন্দে উছলে উঠে তা জানি নি। কিন্তু একটা সান্ত্বনা—ভুল করেছি; প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব। যতখানি ক্ষতি করেছি, তার বেশী লাভ দেখাতে পারব।

কমলা ঘৃণায় শিহরিয়া বলিল "তা হ'লে আবার কাপড়ই পরবে তো? টেবিল চেয়ার সরিয়ে মেঝেয় পাতবে মাদুর, দেশী খাওয়া—কলাইয়ের ডাল, পুঁই শাকের তরকারি—"

হাসিয়া নিখিল বলিল "চমৎকার। তুমি নাম করছ আর আমার জিভে জল আসছে। বড় উপাদেয় জিনিস কমলা, ওতে মানুষ গাধা হয় না, মানুষ হয় কারণ মাথাও ঠাণ্ডা, পেটও ঠাণ্ডা। পৃথিবীর সার দুটী জিনিস ঠাণ্ডা থাকলে অনেক বিষয় ধারণা করতে পারা যায়। শোনো,

ময়ূরপুচ্ছে-ঢাকা দাঁড়কাক, দাঁড়কাক বই আর কিছুই নয়। এ ময়ূরপুচ্ছ প'রে লোকের হাসিই কেবল উদ্দীপ্ত করে দিচ্ছি আমি; তাই এ গুলো ফেলে দিয়ে আবার আমি যা—তাই হ'ব। আমাদের জাতীয় পোষাক আজ খদ্দর; আমি প্যাণ্ট ফেলে খদ্দর পরব।"

খদ্দর? কমলা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নিখিলের মত বিলাসী লোক যে মোটা খদ্দর ব্যবহার করিবে ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

নিখিল বলিল "তুমি ভাবছ আমি হয় তো ঠাট্টা করছি। কিন্তু তা নয় কমলা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিলাতী আর জীবনে পরব না। দেখো তুমি—আমার ব্রত আমি শেষ করতে পারি কিনা?

সে বাহিরে চলিয়া গেল।

---

(৩)

রাজপথে লোকের ঢেউ। সবার পরণে মোটা খদ্দর, মুখে হাসি, চোখ আনন্দে দীপ্ত। কমলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া সরিয়া গেল।

কিন্তু হৃদয়ে একটা নূতন কথা জাগিয়া উঠিল। এ আবার কি? এ শান্তসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিবে কে তাহা ভাবিয়াছিল।

বাস্তবিক ইহার মূলে আছে কি? বসন্ত সমাগমে গাছগুলি যেমন নবপল্লবে বিকশিত হইয়া উঠে, বৎসরের সঞ্চিত পুরাতন পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে, এমন তাই ভারতবাসী আজ পুরাতন ফেলিয়া নূতন গ্রহণ করিয়াছে, সে আজ নবীন, সে আজ দীপ্ত। কমলা দেখিল—এ মহামিলনের দিনে কেহ দূরে পড়িয়া নাই; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান, সবই এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সানন্দে দাঁড়াইয়াছে।

আশ্চর্য্য হইয়া কমলা ভাবিতে লাগিল।

এ ঢেউয়ে যদি তাহার ঝি চাকরগুলি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে উপায়? যদি তাহারা বলে যে বাড়ীতে কেবলমাত্র বিলাতী ব্যবহার হয়, সে বাড়ীতে তাহারা কাজ করিবে না?

কিন্তু ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে? যাহারা ঝি, চাকর রয়েছে তাহাদের আবার দেশমাতৃকার পূজা কি? তাহারা চাকরী করিতে আসিয়াছে, দেশভক্তি রাখিলে তাহাদের চলিবে না।

কিন্তু কি ভীষণ এই দাসত্ব জীবন? সুরেন বলে বড় মিথ্যা নয়। চাকরী করিতে গেলে সবই করিতে হইবে, না বলিতে সাহস হইবেই না। চাকরী লোকে ক'রে করে কেন? নাঃ?

তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া ? দেশের লোকের চাকরীই সম্বল, চাকরী গেলে উহারা খাইবে কি ? আর চাকরী ছাড়িলে সবই যে অচল হইয়া পড়িবে ; কোর্ট, আফিস, রেল, মিল প্রভৃতি সবই যে বন্ধ হইয়া যাইবে। ইস্! এতদূর করিতে সাহস হইবে তাহাদের ? কখনও না, ইহাতে যে তাহাদেরই ক্ষতি। এতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে ভারত কখনই প্রস্তুত হইতে পারিবে না। এ কি সভ্যতার প্রতিমূর্ত্তি ইউরোপের যে কোনও দেশ, যে বুকে সাহস আনিয়া দাঁড়াইবে ? সে দেশ আর এ দেশে ঢের তফাৎ। দাসত্ব যাহাদের জন্মগত ব্যবসা, তাহারা কখনই নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এ যা দেখা গেল, এটা সাময়িক উত্তেজনা বই আর কিছুই নয়। কাল প্রাতেই আবার দেখা যাইবে ছেলেরা বই লইয়া স্কুল, কলেজে চলিয়াছে, আফিসের বাবুরা আফিসমুখো ছুটিয়াছে। এমন ঢেউ সেই আর একবার আসিয়াছিল না, বন্দেমাতরম বলিয়া ছেলেরা যখন সব দাঁড়াইয়াছিল ?

কমলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল : সব মিথ্যা। দুদিনের তরে আস্ফালন, সঙ্কীর্ত্তন; চরকার প্রচলন, সূতা কাটা তারপর সবই চুপচাপ।

খদ্দর আর কয়দিন ? একটু বাহাদুরীর জন্য সবাই এখন খদ্দরের অনুরাগী, দুদিন বাদে এ খদ্দর মিলাইয়া যাইবে। বিলাতী মসৃণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া মোটা খদ্দর ব্যবহার নিতান্তই হাস্যকর করা মাত্র।

ও দিকে বাবুর্চ্চি ও চাকর মহলে যে গোলমাল ঘটিয়া গিয়াছিল কমলা তাহা জানিত না। তাহারা কেহই কমলার কাছে আসিল না, নিখিলের কাছে আরজী পেশ করিল। তাহারা এই বিলাতী হাওয়ায় আর থাকিবে না।

নিখিল মাথা দুলাইয়া বলিল "এটা ঠিক কথা। কিন্তু দেখছ তো আমি বেকার বাইরের মানুষ। তোমাদের গিন্নির কাছে এ কথাটা বল গিয়ে, আমায় জড়িয়ো না।"

দাসী কমলাকে গিয়া জানাইল চাকর বাবুর্চ্চি সব চলিয়া যাইতেছে।

আশ্চর্য্য হইয়া কমলা বলিল "কেন ?„

দাসী বলিল "তারা ঘরে ফিরে চাষ করে খাবে। যে বাড়ীতে বিলাতীর এত ছড়াছড়ি, সে বাড়ীতে আর কাজ করবে না। তবে যদি আপনি এ সব বিলাতী জিনিস ফেলে দেন—"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া কমলা বলিল "বটে, চাকরী যাদের জাত-ব্যবসা, তারাও তা, এই হুজুগে পড়ে ছাড়তে চায় ? এতদূর স্পর্দ্ধা যে বিলাতী জিনিস ছোঁবে না ?"

দাসী নরমস্বরে বলিল "ঝি চাকরেরও কি দেশের পূজা করতে নেই মা ? তারা খাটতে এসেছে বলে মনটাকে তো বিক্রী করে নি। আপনি বিলাতী চালে চলবেন, বিলাতী ঝি-চাকর রাখুন। পয়সা থাকলে খাস বিলাতী লোক পাবেন। আমরা সব প্রতিজ্ঞা করেছি বিলাতী ছোঁব না। আপনি দেশী হোন, দেশী জিনিস নিন, আমরা আজীবন আপনার কাজ আহ্লাদের সঙ্গে করব।

রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া কমলা বলিল "যাও এক্ষুনি আমার বাড়ী হতে। আমার ক্ষমতা হয় যদি আমি অন্য ঝি চাকর বাবুর্চ্চি আনাব।

দাসী চাকর সব চলিয়া গেল।

নিখিল আসিয়া বিশুষ্কমুখে বলিল "কি করলে কমলা, আজ উপোস করে থাকতে হবে দেখছি। আমরা আজও বিলাতী চালে চলি—এ শুনে কেউ আসছে না কাজ করতে।"

দর্পিতা কমলা বলিল "আমি নিজে রাঁধছি গিয়ে তাতে আর মরে যাব না। পারি যদি বিলাতী ঝি চাকর রাখব, না পারি নিজের হাতে কাজ করব। এ দেশের লোককে আমি বেঁচে থাকতে কখ্খনো কাজে নেব না।"

নিখিল বলিল "নিজে খেটে মরবে তবু বিলাতী নেশা ছাড়বে না?"

কমলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "না।"

নিখিল বলিল "যা খুসি তোমার তাই করো, আমি আর কিছু তোমায় বলতে চাই নে।"

সে চলিয়া গেল।

সে দিন অনভ্যস্ত হাতের রন্ধন যা হইয়াছিল, সে আরও চমৎকার। নিখিল পাতের নিকট বসিল মাত্র, তাহার পর বাহিরে গিয়া হোটেলের খাবার আনাইয়া পেট ভরাইল। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার মনটা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল দাসী-চাকরের ব্যাপারে তাহার যে কতখানি হাত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কমলাকে বশে আনিবার এই একটা সহজ উপায় সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

কিন্তু কমলা সে দিন যে কি পরিমাণে লজ্জিত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

---

(৮)

কিছুদিন আগে সুরেন দেশে, গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া নিখিলের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

নিখিল বলিল "তারপরে—দেশের খবর কি?"

সুরেন নিখিলের পরিধেয়—খদ্দরের জামা ও কাপড়ের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "খবর সব ভাল, কিন্তু তোমার খবর কি?

নিখিল হাসিমুখে বলিল "অবশেষে সার করেছি এই খদ্দর।"

সুরেন বলিল তাইতো দেখছি ব্যাপার ক্রমেই বড় মারাত্মক হয়ে উঠল। না আর বাঁচতে দেবে না।

নিখিল তাহার হাতখানা ধরিয়া একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল "ইয়ারকি নয় বন্ধু, কাল দেশে যাব ভাবছি।"

সুরেন এতখানি হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নিখিল তাহার পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল "ফের অতখানি হাঁ। মুখ বুজোও বলছি।"

সুরেন বলিল হাঁ করবারই কথা যে। আমার বেশ মনে হচ্ছে যখন তুমি মাত্র সাত বছরের, তখন দেশ ছেড়ে চলে এসেছ, আর তারপরে এই চব্বিশ বছর কেটে গেছে, দেশের মুখ আর দেখ নি। দেশের জমিদার তুমি, খাজনার সঙ্গে সম্পর্ক, তা দেওয়ানই সব নিয়ে টিয়ে আসে; দেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কিসের? যখনই বলেছি দেশে যাবার কথা, তুমি আমায় ধরে মারতে বাকী রেখেছ মাত্র। সেই তুমি যাবে কিনা সেই দেশে? অমন কাজ কোর না নিখিল, বন্ধুর কথা শোন। দেশের অসভ্য লোকগুলোর হাওয়া গায়ে লাগলে তোমার এমন হিমানী-মাখা একটু যে সাদা রং—তা আবার ময়লা হয়ে যাবে। সে বাতাসে তোমার হার্টও জখম করতে পারে, ব্রেণও কনজেষ্টেড্ হতে পারে। দেশে কি ছাই ট্রাম, মটরফিটন রিকসা চলে? না ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান চলে? সাবধান নিখিল, সাধ করে—

নিখিল তাহার মুখ চাপিয়া বলিল "কি কতকগুলো বকে যাচ্ছো তার ঠিক নেই।"

মুখ ছাড়াইয়া লইয়া সুরেন বলিল "কিন্তু এ কথাগুলো ঠিক আমার নয়, আমি চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে যাচ্ছি মাত্র।"

লজ্জিত নিখিল বলিল "তা বটে। যাক ভাই, যা বলবার, যা করবার তা করে ফেলেছি, আরতো হাত নেই; তার এখন প্রায়শ্চিত্ত করব। তুমি একবার আমার বাড়ী মধ্যে গিয়ে ব্যাপারখানা দেখে এসো।"

সুরেন বলিল "কেন, সেখানেও খদ্দর নাকি?"

নিখিল কুঞ্চিত মুখে বলিল "রামঃ, অমন ভয়ানক কথা মুখেও আনে খদ্দর প'রে—দেখছ বাইরে বসে আছি, বাড়ী মধ্যে গেলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। চালাকি সেখানে আর খাটে না, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

সুরেন বলিল "তবে আমাকেও তো তাড়াবে। আমার পরণে খদ্দর যে।'

নিখিল বলিল "তা তাড়াতে পারে বটে, সে বিশ্বাস আমি করি। কিন্তু তুমি একবার উঁকি দিয়ে আমার রান্নাঘরটা দেখে এসো, তখনি পালিয়ো নচেৎ বলবে আমিই তাকে অপমান করবার জন্যে তোমায় ডেকে দেখাচ্ছি। তারজন্যে কঠোর শাস্তি আমায় পেতে হবে।"

সুরেন বলিল "সে ভয় নেই, তোমায় আমি বিপদগ্রস্ত করব না।"

সে যাইতেছিল, নিখিল বলিল "জুতোটা খুলে যাও, নইলে শব্দ হবে।"

সুরেন বলিল "ভয় নেই, এ সবই শব্দহীন, যাকে বলে একদম নিরহঙ্কারী। এ তোমার বিলাতী জুতো নয় যে অহঙ্কারে মচ মচ করবে।"

রন্ধনগৃহের দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল বেচারী কমলা ভাতের হাঁড়ি উনান

হইতে নামাইবার সহজ উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না, এদিকে ভাত পুড়িয়া ধোঁয়া উঠিতেছে।

তাহার বিপদগ্রস্থ ভাব দেখিয়া স্থরেনের বড় দয়া হইল, সে লুকাইয়া থাকিতে পারিল না; অগ্রসর হইয়া "বলিল সর বউদি, আমি ভাত নামিয়ে দিচ্ছি।"

আসন্ন এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কমলার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইয়া উঠিল, একটাও কথা না কহিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

স্থরেন কেমন তৎপরতার সহিত ভাত নামাইয়া দিল, হাসিয়া বলিল "দেখলে বউদি, সব কাজেরই একটা যোগ্যতা চাই। দেহটাকে একটু হেলাতে হয়, সাজানো পুতুলের মত চুপচাপ চেয়ারে বসে ক্রুশকাঁটা নিয়ে থাকলে চলে না। আমি রেঁধে দিচ্ছি। তোমরা যা পার না, আমরা পুরুষ হয়ে যে তা পারি, এটা ভেবে একটু লজ্জিত হওয়া তোমাদের উচিৎ, কারণ এ কাজটা তোমাদেরই একচেটিয়া। কেবল শিক্ষার অভাবেই তোমার এ দুর্দ্দশা। আমার মতে বউদি, বড় লোক হলেও তার সব শেখা ভাল, না হলে যখন ঝি চাকর বাবুর্চ্চি চলে যায়, উপোস করে থাকতে হয় না; কিম্বা ধূলোয় 'পড়ে গড়াগড়ি দিতে হয় না।

কমলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে একটাও কথা কহিতে পারিল না। কাল্‌কে নিখিলের খাওয়া হয় নাই, সেকথা তাহার মনে ছিল, সে আজ তাই রাঁধিয়া করিতে পারিল না, আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের অকৃতকার্য্যতা আজ তাহাকে যতটা পীড়ন করিতেছিল ততদূর আর কখনও তাহাকে কোনও কারণে পীড়িত হইতে হয় নাই।

চব্বিশ বৎসর পরে দেশে জমীদারের আগমন, দেশ পুলকে ভরিয়া উঠিল।

নিখিল স্থরেনের সাহায্যে দেশের অনেকটা কাজ করিয়া ফেলিল ঘরে ঘরে চরকা বসিয়া গেল, নিজে সে একখানা তাঁত আনিয়া বসাইল, তাঁতিও আসিয়া পড়িল একদিন মহাসমারোহে গ্রামবাসীগণ খদ্দরের উদ্বোধন করিল।

দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, দেশবাসী জমীদারকে চিনিল। জমীদার যে তাহাদেরই মত তাহাও বুঝিল। নিখিল রিক্তপদে চাষাদের সহিত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া জমা ও ফসল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য তাহাদের শিখাইয়া দিল। আবার আগত মাসে সে দেশে আসিবে অঙ্গীকার করিয়া সে কলিকাতায় ফিরিল, স্থরেন ও তাহার সহিত ফিরিল।

শিয়ালদহে পৌছিয়া স্থরেন বলিল "একখানা ট্যাক্সি করা যাক বাড়ীর গাড়ী আসে নি দেখছি।"

নিখিল সংক্ষেপে বলিল দরকার কি? বাবুগিরি করে মিথ্যে পয়সাটা খরচ হবে, সে পয়সাটা দেশের কাজে লাগালে সার্থক হবে।"

সুরেন হাসিয়া বলিল "আজকাল তোমার জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে হয়েছে দেখতে পাই।"

নিখিল বলিল "সময়ে সবই হয়। এখন আমি ভাবছি সাতদিনের জায়গায় তো, একমাস কাটিয়ে এলুম দেশে, এখন আমার রক্ষটী—"

বাধা দিয়া সুরেন বলিল "তোমার রক্ষ ঠিক আছে, তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই তোমার।"

নিখিল বলিল "তা জানি. তবে কথা হচ্ছে কি, বাড়ীতে যাব কি দূর দূর করিয়ে তাড়িয়ে দেবে। সে আবার তেম্‌নি।

সুরেন বলিল "তোমার কথাই অমনি। তুমি বড় বাড়িয়ে কথা বল। বউদি একদিন ও দূর কথাটা মুখে আনেন নি, মিথ্যে কেন সে বেচারার নামে দোষ দাও।"

পদব্রজে দুই বন্ধু বাড়ী চলিল।

বাড়ী গিয়া পৌছিবামাত্র পুরাতন ভৃত্য, দাসী প্রভৃতি আসিয়া একমুখ হাসি লইয়া উভয়কে প্রণাম করিল। তাহাদের পরিধানে খদ্দর।

সুরেন বলিল "তোমরা যে আবার?"

দাসী বলিল "মায়ের ডাকে এসেছি।"

নিখিল বিস্ময়ে বলিল "খদ্দর পরেছ?"

ভৃত্য বলিল "মায়ের আদেশ।"

নিখিলকে টানিয়া লইয়া সুরেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

শয়ন গৃহের দ্বারে দাঁড়াতেই চরকার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

"তাই তো, টেবল চেয়ার সব গেল কোথায়? মেঝেয় ঢালা মাদুর পাতা এ আবার কি লীলা—কমলা?"

হাস্যমুখী কমলা চরকা রাখিয়া উঠিয়া স্বামীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

সুরেন বলিয়া উঠিল "বউদি কি মরে জন্ম নিলে নাকি?"

কমলা হাসিয়া বলিল একরকম "তাই বটে এ মরে জন্ম পাওয়াই বটে। দেখছ, আমার বাড়ীতে বিলাতী আর কিছু নেই; এসব দেশী জিনিস। আমি ভাই পোষাক-টোষাক সব পুড়িয়ে ফেলে খদ্দর ধারণ করেছি।"

নিখিল সুরেনকে বসাইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল। সুরেন বলিল "এখন রাঁধতে শেখো বউদি। আবার যেন বেচারী নিখিলকে বোকা পেয়ে পোড়া ভাত, কাঁচা তরকারীগুলো খাইয়ো না।"

হাসিয়া কমলা বলিল "বারবার নেড়া বেলতলায় যায় না ভাই। আমি রাঁধতে শিখেছি

প্রতীক্ষায়

শিল্পী—শ্রীবনকুমার বসু

কিনা আজই তোমায় দেখাব। এখন দেখবে এসো আমি চরকায় কতখানি সূতা তৈরী করেছি। শুনেছি দেড়পোয়ায় একখানা কাপড় হয়। আজই আমায় এই সূতাতে কাপড় বুনতে দিতে হবে। আর দেখ, তুমি আর এ ভূতের বাগার খাটতে পারবে না। এবার আমাকে দেশে নিয়ে যেতে হবে, আমি আর কলকাতায় থাকব না। দেশের মেয়েছেলে দেশে না থাকলে কি চলে?"

সুরেন বলিল "সে কথা ঠিক বউদি, লক্ষ্মীরূপা হয়ে দেশে বাস করবে চল। তোমাদের কল্যাণে দেশ আবার হেসে উঠবে, দেশের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠবে। তোমার হাতের সূতার কাপড় আমি আজই বুনতে দিয়ে আসব'খন। দেশেও আমরা তাঁত নিয়ে গেছি, আমরা সব শিখব, তুমিও শিখবে।

কমলা হাসিয়া বলিল "যাও তোমরা স্নান করে নাও। আজ আমি রান্নার পরীক্ষা দেব— আজ থেকে আমার নূতন জীবন।" সুরেন ও নিখিল কলতলার দিকে অগ্রসর হইল।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

গুম্ফ-বিকাশ

গুম্ফাগ্র—উর্দ্ধগামী

বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী- ইতি ভাবঃ

পরমানন্দ

আহারে হস্তারক হয় না—

চরমোৎকর্ষ

"হেট ঘোড়া হেট্ হেট্"

কন্‌ক্রীট করা

নিবিড় অরণ্যানীবৎ-সূর্য্যালোকও প্রবেশ করিতে পারে না

হামবড়া
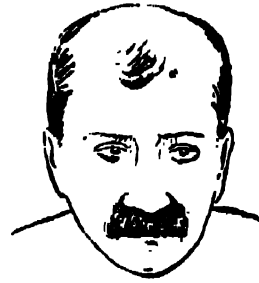
যতই বোঝাও—তর্ক কর কিছুতেই তো মান্‌বো না

ব্যাতা বিধ্বস্ত

এর উপর দিয়ে সংসারের সুখ দুঃখের ঝড় বয়ে গিয়েছে

আনারসের মুখী

পল্লীর আওতায় মন্দ বাড়ে না

বেঙ্গল টাইগার
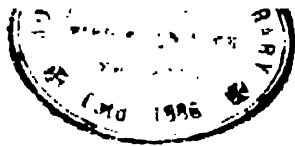
বিশ্ববিদ্যালয়-কুঞ্জে করহ সন্ধান

গ্রন্থি-সঙ্কুল

গাঁটে গাঁটে রস

ইঁদুর-খেকো

নব্যবঙ্গের পরমাদর্শ

চিচিঙ্গে

অন্ধকারে সর্পভ্রম হয়

[illegible]

"এই করে করে গোঁফ পাকালুম—বুঝেছ।"

ধ্বংসাবশেষ

তবুও কত যত্নে রাখি
সদাই অসন্তুষ্ট

চুং চু চাপং চা
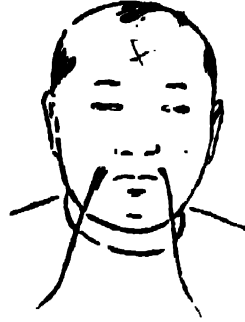
রিফরমের দৌলতে অন্তর্হিত প্রায়

অসন্তোষের ঢেউ গোঁফের উপরও বহিতেছে

থেংরা—প্যাটার্ণ

বিছানা ঝাঁট ত দেনই, দরকার হলে ধরও—

মধ্যপন্থা

বয়েস হয়েছে একেবারে ছোট করতে
লজ্জা হয়—তাই—

বিভীষণ

অন্ধকারে দেখলে প্রাণটা আঁৎকে উঠে

কৈসর-গঞ্জন

জার্ম্মাণ-পরাভবের সহিত তিরোভবমান

প্রাইম-মিনিষ্টার

ভূতপূর্ব মন্ত্রী লয়েড জর্জের অনুকরণে
রমণী-মন-মোহন

ময়ূরপুচ্ছ

গুম্ফ আমার নাচেরে ময়ূরের মত নাচেরে

ম্যাথামেটিক্যালি এ্যাকুরেট
বাইজী-বাহন

পঞ্জাব-কেশরী

এরির নাম "মোচ."

তবলায় চাটী দিতে মজবুত

লাকলাইন

খুকী দোল খায়---তার মার মনে দুঃখ হলে গলায়
দিয়ে আত্মহত্যা কর্ত্তে পারে
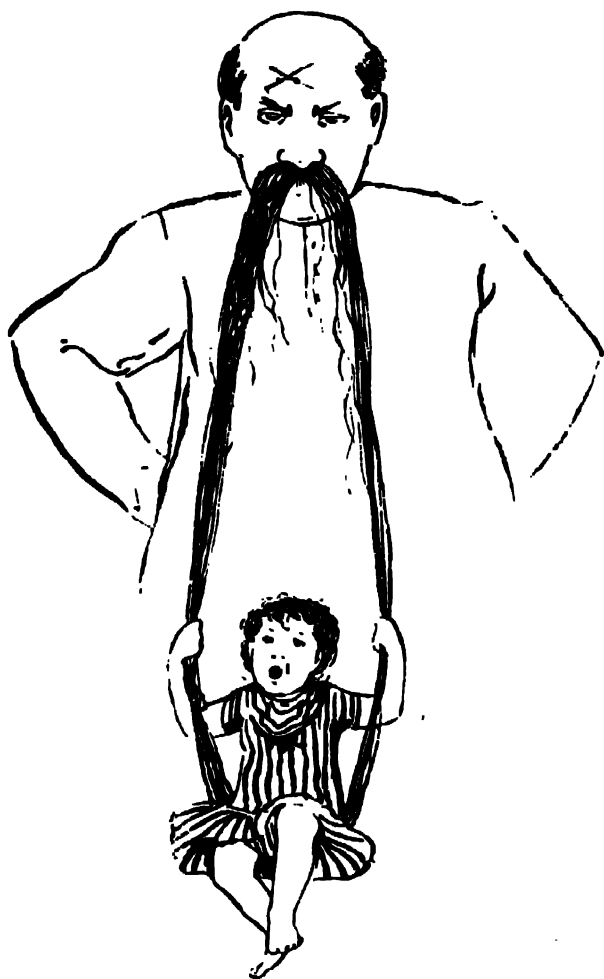
মরুভূমি

বৃক্ষলতাদি বর্জিত—ধূ—ধূ—ধূ

বিনোদবেণী

দরকার হলে খোঁপাও বাঁধা যায়

চটিতং

যাও—যাও—জ্যাঠামো করো না।

কাব্যিফেসান

বারান্দার তলে, চলে হেলেদুলে—
[illegible] অনিমেষে উপরেতে চায়

সম্পাদকীয়

দেখলেই মনে হয় যেন সম্পাদকটা

শেঁকো বিষ

(গল্প)

ফাল্গুনের এক উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। কালনা মহকুমার দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবুর পত্নী প্রভাবতী স্বামীকে কহিলেন, "আজ দুপুর বেলা একবার ডেপুটি বাবুর বাড়ী বেড়িয়ে আসব ?"

মুন্সেফবাবু হাসিয়া কহিলেন, "বেশ ত যেয়ো। দুইজনই ত লেখিকা বনবে ভাল।"

প্রভাবতী কহিল, "আমি আবার তাঁর কাছে লেখিকা।"

মুন্সেফবাবু কহিলেন, "কিন্তু তাঁর চেয়ে তোমার গল্প আমার ভাল লাগে।"

প্রভাবতী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "যাও আর অত ঠাট্টা করতে হবে না। আমার আবার লেখা।"

মুন্সেফবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ও লেখিকার বিনয় প্রকাশ। ওতে আমায় ভোলাতে পারবে না।"

প্রভাবতী পরিহাস করিয়া কহিল, "তুমি ত সব জান, যারা নিজেদের বড় লেখক মনে করে তারা আর এমন বিষয় প্রকাশের ধার ধারে না ; আমি যদি নিজেকে একজন বড় লেখিকা বলে মনে করতাম, তা হ'লে দেখতে আমি খুব গম্ভীর হ'য়ে ছোট্ট করে একটা হুঁ বলে চুপ করে থাকতাম।"

মুন্সেফবাবু কহিলেন, "তোমরা লেখ, কাজেই লেখকদের খবর তোমরাই বেশী জান। যাক্, তুমি সেখানে গেলে, তিনিও নিশ্চয়ই এখানে আসবেন। কিন্তু তারা খ্রীষ্টান তা জান ত ?"

প্রভাবতী কহিল, "তা জানি, আসবেন তাতে হ'য়েছে কি ? তিনি ত আর আমার ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্চেন না ?"

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "তুমি যে রকম হিন্দুয়ানী কর, তাতে পাছে তুমি বিপদে পড়ে যাও সেই জন্য তোমায় মনে করিয়ে দিলাম।"

প্রভাবতী কহিল, "হিন্দুয়ানী করি বলে ত আমি আর পাগল নই যে, একজন অন্য জাতের কেউ ঘরে বসলে মনে করব আমার বাড়ী অপবিত্র হ'য়ে গেল।"

মুন্সেফবাবু হাসিয়া কহিলেন "আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি লেখিকা। তোমার মনটা কত উদার।"

প্রভাবতী কহিল, "ঐ তোমার আর একটা মস্ত ভুল ধারণা লেখক লেখিকা হ'লেই বুঝি তারা উদার হয় ; বরং অনেক ক্ষেত্রে শুনতে পাওয়া যায় এবং আমি নিজেও দেখেছি, উদার হওয়া দূরের কথা, তাদের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ, লেখবার সময় তাঁরা অনেক ভাল কথা, অনেক বড় বড় কথা লিখে থাকেন কিন্তু কাজের বেলা তাঁরা ঠিক উল্টা পথে চলেন।"

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "আমার ঘাট হ'য়েছে।"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।

প্রভাবতী হাসিয়া কহিল "একশ বার; না জেনে কথা বল্‌তে যাও কেন ?

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "তোমাকে দেখে অন্ততঃ আমার এ কথা বোঝা উচিত ছিল।"

প্রভাবতী জোর দিয়া কহিল, "ছিলই ত। দেখি গে ঠাকুর রান্নাঘরে বসে কি ছাইভস্ম রাঁধচে।" একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিল, "আগে খবর দিতে হবে ত "

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ তারা সাহেব মানুষ। অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্ম তাঁকে ত প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে।"

প্রভাবতী কহিল, "আমি চিঠি লিখে আস্‌ছি তুমি চাপরাসীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।"

---

(২)

স্বামী কাছারী চলিয়া গেলে, সকাল সকাল আহার করিয়া প্রভাবতী ডেপুটী বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। ডেপুটী বাবুর পত্নী উমারাণী তখন ভিতরের বারান্দায় বসিয়া এক যজ্ঞোপবীতধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতেছিল। প্রভাবতী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া মাথার কাপড়টি আর একটু টানিয়া দিয়া থামের পাশে দাঁড়াইল। উমারাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া সাদরে তাহার একখানি হাত ধরিয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "উনি আমার বাবা।"

প্রভাবতী অবাক হইয়া উমারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমারাণী হাসিয়া কহিল, "আপনি আমার কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছেন। তা হবারই কথা। আমরা খ্রীষ্টান কিন্তু আমার বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ। আপনি দয়া করে এই ঘরটিতে একটু বসুন, বাবার খাওয়া প্রায় হ'য়ে এল, আমি এখনই আস্‌চি। "কিছু মনে করবেন না।"

প্রভাবতী কহিল, "ঘরে কেন, আমি এইখানেই বসি।"

উমারাণী খুসী হইয়া কহিল, "কি জানি যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে, তাই বল্‌তে সাহস করি নি।" পিতার শূন্ম থালার পানে চাহিয়া কহিল "আর দুটী ভাত দি বাবা, দুধ দিয়া খান।" এই বলিয়া এক হাতা ভাত তুলিয়া পিতার পাতে দিল।

প্রভাবতী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। একি অদ্ভুত কাণ্ড! তাহার এতখানি বয়সের মধ্যে এরূপ ব্যাপার ত ইতিপূর্ব্বে তাহার চোখে পড়ে নাই।

পিতা আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। উমারাণী প্রভাবতীকে লইয়া অন্ম এক ঘরে গিয়া বসিল।

প্রভাবতী কহিল, "আপনার খাওয়া হ'য়েছে ?"

উমারাণী কহিল, "না এইবার খাব। আমার ভাত ঐ যে ঢাকা রয়েচে।"

প্রভাবতী কহিল, "আপনি আগে খেয়ে নিন।"

উমারাণী হাসিয়া কহিল, "অসভ্য মনে করবেন না ত ?"

প্রভাবতী হাসিয়া কহিল, "তা যা হ'ক একটা কিছু মনে করব। আপনি খেতে বসুন ত ?"

দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণেই উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল—,যেন তাহাদের কত-দিনের পরিচয় !

প্রভাবতী প্রশ্ন করিল, "আপনি নিজেই রাঁধেন নাকি ?"

উমারাণী কহিল, "রাঁধি বই কি ভাই। যার তার হাতে ওঁকে খেতে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। তা ছাড়া স্বামীকে রেঁধে খাওয়ান স্ত্রীলোকের কি কম ভাগ্যের কথা "

প্রভাবতী লজ্জিত হইয়া কহিল, "সে নিশ্চয়ই।"

জানালার ভিতর দিয়া উঠানের দিকে চাহিতেই তুলসী-মঞ্চের উপর প্রভাবতীর দৃষ্টি পড়িল। গাছটী বেশ সতেজ। দেখিলেই মনে হয়, গাছটির প্রতি বিশেষ যত্ন করা হইয়া থাকে। প্রভাবতী মনে করিল, উমারাণীর বাবা বোধ করি মাঝে মাঝে আসেন, তাহারই জন্য এই তুলসী গাছ রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কৌতূহল উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে কহিল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

উমারাণী কহিল, "এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন।"

প্রভাবতী কহিলেন, "আপনি বল্লেন আপনার বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ, আপনি খ্রীষ্টান, অথচ তিনি আপনার হাতের ভাতও খেলেন, বাড়ীতে আবার তুলসী-মঞ্চও দেখ্‌চি ; এতক্ষণ সাহস করে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না "

উমারাণী হাসিয়া কহিলেন "আমার শ্বশুরও হিন্দু, কেবল উনি আর আমি খ্রীষ্টান। আমার বাবা ত আমার হাতে খানই। আমার শ্বশুরও আমার হাতে খান—শুধ্ খান কেন বলচি, তিনি খেতে ভালবাসেন। আপনার নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে।"

প্রভাবতী বিস্ময়াভিভূত হইয়া কহিল, "সত্যি আমার যেন কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্চে।"

উমারাণী হাসিল, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না।

গৃহে ফিরিয়া প্রভাবতী স্বামীকে সব কথা খুলিয়া কহিল, "এরা কি পালিয়ে বিয়ে করেচে নাকি ?"

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "আমিও ত ব্যাপার কিছু বুঝতে পারচিনি। ডেপুটী বাবুর চাল চলন দেখলে ত মনে হয় না, উনি খ্রীষ্টান। তবে লোকে বলে খ্রীষ্টান, তাই শুনি।"

প্রভাবতী কহিল, "কিন্তু উমারাণী নিজের মুখে বল্‌লে যে তারা খ্রীষ্টান।"

মুন্সেফ বাবু কহিলেন, "ডেপুটী বাবু ত মিত্র। তার শ্বশুর ব্রাহ্মণ বল্লে না ? তা হ'লে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান্ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাক্‌তে পারে না। হিন্দু হ'লে মিত্রের সঙ্গে ত

আর ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হ'তে পারত না। ভেতরের খবরটা একবার জেনো দিকি ?"

প্রভাবতী কহিল, "আমারও ভারি কৌতূহল হ'য়েছে। সে যাই হ'ক গে উমারাণী কিন্তু লোক খুব ভাল। আমার ভারি ভাল লেগেচে।"

মুন্সেফ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা ত লাগবেই। তিনি যে লেখিকা।"

প্রভাবতী কহিল, "তা ত বটেই। হ্যাঁ গা খ্রীষ্টানের মেয়েরা কি সিঁদুর পরে! কিন্তু উমারাণীর সিঁথীতে দেখ্‌লাম খুব মোটা সিঁদুরের রেখা আর কপালে এক সিঁদুরের টিপ্‌।"

মুন্সেফবাবু কহিলেন, "তোমায় দেখাবার জন্য বোধ হয় সেজেছিলেন।"

প্রভাবতী অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "তা হবে।"

ক্রমে প্রভাবতী ও উমারাণীর মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল, কিন্তু ভিতরের কথা প্রভাবতী কিছুই জানিতে পারিল না। নানাজনের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। প্রভাবতীর আর ও প্রশ্ন করা হইত না, তাহা ছাড়া অনেক দিন সে প্রশ্ন তাহার মনেই উঠিত না।

দিন কতক পরে প্রভাবতী তাহার স্বামীকে কহিল, "উমারাণীর চেয়ে ডেপুটী বাবু আরও সুন্দর।"

মুন্সেফবাবু দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তাই না কি! আচ্ছা আমার চেয়েও সুন্দর ?"

প্রভাবতী চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই। তুমি বুঝি আবার সুন্দর!"

মুন্সেফবাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "এই বুঝি তোমার স্বামীভক্তি!"

প্রভাবতী মনে মনে হাসিয়া কহিল, "আমি অত ভক্তির ধার ধারিনা।"

একদিন প্রভাবতীর প্রশ্নের উত্তরে উমারাণী কহিল, "ওঁর কোন কাজ নিজের হাতে করতে না পারলে, আমার যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না ভাই, ওঁকে আমি দেবতা ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারি নি।"

প্রভাবতী মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে কহিল, 'খ্রীষ্টানের মেয়ে আবার স্বামীকে দেবতা বলে ভাবে, এ ত কখনও শুনিনি। উমারাণীর সবই নূতন!

সে দিন উমারাণীর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মুন্সেফবাবু কহিলেন, "একজন খ্রীষ্টান মেয়ে স্বামীভক্তিতে তোমাকে হারিয়ে দিলে ?"

প্রভাবতী কহিল, "ঠাট্টা নয়, সত্যি বলচি, উমারাণী যেন সত্যি উমারাণী--তার মত স্বামীকে ভক্তি করতে আমি খুব কম স্ত্রীলোককেই দেখেচি।"

আর একদিন কি এক পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুল, কাছারী বন্ধ ছিল প্রভাবতী বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, ঘরের মেঝেয় বসিয়া উমারাণীর দুই ছেলে আর এক মেয়ে একত্রে দেব-দেবীর একটী স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, আর উমারাণী তাহার স্বামীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে।

উমারাণী দূর হইতে প্রভাবতীকে দেখিয়া নিজের ক্রোড়দেশ হইতে স্বামীর পা দু'খানি শয্যার উপর ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া প্রভাবতীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রভাবতী হাসিয়া কহিল, "আজ এ সময়ে এসে ভাল করি নি ভাই, তোমার স্বামী-সেবায় বাধা দিলাম।"

উমারাণী পাশের ঘরে প্রভাবতীকে বসাইয়া কহিল, "উনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন। তুমি এসেচ ভাই ভালই হ'য়েছে। কাল সেই গল্পটা শেষ করেচি, তোমাকে শুনিয়ে পাঠিয়ে দেব মনে করচি। "তোমার গল্পটা পাঠিয়ে দিয়েচ ?"

প্রভাবতী কহিল, "দিয়েছি ত, কিন্তু তাঁরা কি পছন্দ করবেন ?"

উমারাণী কহিল, "ও রকম গল্প তাঁদের কাগজে ক'টা বেরিয়েছে জান যে, তারা পছন্দ করবেন না।" এই বলিয়া সে তাক্ হইতে একখানি খাতা পাড়িয়া আনিল।

প্রভাবতী কহিল, "গল্পের কি নাম দিয়েচেন দিদি ?"

উমারাণী কহিল, "শেঁকো বিষ"।

প্রভাবতী হাসিয়া কহিল' "শেঁকো বিষের ব্যবস্থা কেন ? কাউকে নিশ্চয়ই খুন করেচেন। পড়ুন শুনি !"

উমারাণী গল্পটী পড়িতে আরম্ভ করিল।

(ক)

হরিদ্রাপুর গ্রামে পরম নিষ্ঠাবান আচারপরায়ণ শ্রীধর চট্টোপাধ্যায় কন্যাগত প্রাণ ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিয়া বলিতেন, "কন্যাদের আদর যত্ন করিতে আমরা মানা করি না। তবে এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই মেয়েরাই ত যত দুঃখ কষ্ট বহন করিয়া আনে,—বিধবা হইয়া স্বামী-পরিত্যক্তা হইয়া, আরও কত রকম করিয়া।"

শ্রীধর দুইটী কন্যা শিখরবাসিনী ও দুর্গারাণীকে গভীর স্নেহে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিতেন, "আমার মা যে।"

এমনই ভাবে পিতার অফুরন্ত আদর স্নেহের মধ্যে দুই ভগিনী বাড়িতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সামান্য কিছু জমি জমা ছিল, তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার কোন রকমে চলিয়া যাইত।

জ্যেষ্ঠা শিখরবাসিনী কনিষ্ঠা দুর্গারাণীর অপেক্ষা বৎসর পাঁচেকের বড়।

এক দিন শিখরবাসিনীর জননী কহিলেন, "তুমি কি মেয়েদের চাকরী করতে পাঠাবে না-কি ? যে এত করে লেখা পড়া শেখাচ্ছ।"

ইরাবতীতে সূর্য্যাস্ত আলোক চিত্র হইতে

শ্রীধর হাসিয়া কহিলেন, "শুধু চাকরীর জন্তেই বুঝি লেখা পড়া শেখাতে হয়।"

জননী কহিলেন, "কার ঘরে পড়বে তার ঠিক কি; তা' ছাড়া মেয়েছেলের অত লেখা-পড়া শিখে কি হবে?"

শ্রীধর হাস্যোজ্জল মুখে কহিলেন, "আমি মূর্খের হাতে মেয়েকে দেব না-কি। বিদ্বান্ পাত্র ছাড়া মেয়ের বিয়েই দেবনা। ভাল করে লেখাপড়া না শিখ্‌লে তারা তোমার মেয়েদের পছন্দ করবে কেন।"

শিখরবাসিনী প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শিবপূজা করিত. কি করিয়া কি বলিয়া পূজা করিতে হয় পিতা নিজেই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেদিন সবেমাত্র শিবপূজা করিয়া উঠিয়াছে—এমন সময় পিতা আসিয়া কহিলেন, "মাকে আমার শীগগির সাজিয়ে দাও ত, 'দেখতে এসেছে।"

পাত্র তাহার দুই বন্ধু সঙ্গে করিয়া নিজেই দেখিতে আসিয়াছিল। শিখরের বয়স মাত্র তের বৎসর কিন্তু গড়ন বেশ বাড়ন্ত ছিল। পাত্র ও তাহার বন্ধুরা মেয়ে পছন্দ করিয়া একেবারে বিবাহের দিন স্থির করিয়া গেল।

শ্রীধরবাবু যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। পাত্রটী বিদ্বান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী; নাম অঘোরনাথ।

ফুলশয্যার রাত্রি। বাহিরের আকাশ নক্ষত্রমালায় শোভিত, ভিতরের কক্ষ নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভে আমোদিত। শিখরবাসিনীর পিতা দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ফুল পাঠাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পাত্রের সেই দুই বন্ধুও অনেক ফুল উপহার দিয়াছিল। শুধু ফুল দিয়া তাহারা বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য শেষ করে নাই। অঘোরনাথের এক খুল্লতাত ভগিনী হরিমতী যখন ফুলের গহনায় সাজাইয়া কম্পিতদেহ শিখরবাসিনীর হাত ধরিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল, তখন অঘোরনাথের বন্ধুদ্বয়ও সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে হরিমতির সহিত অঘোরনাথের বন্ধুদ্বয় যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন শিখরবাসিনী 'মাগো' বলিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন নববধূর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বাপের বাড়ীর পুরাতন ঝি টগর সভয়ে বলিয়া উঠিল "বাসি অসুখ করেছে না-কি রে?"

শিখরবাসিনীর কচিদেহ অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল। তখন সে আর উত্তর দিল না। তার পর ঝি কে নির্জ্জনে পাইয়া শিখর কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কবে আমি বাড়ী যাব?"

টগর কহিল, "সামনের শুক্রবার।"

তাহার যে এখনও আট দিন দেরী! শিখর চমকিয়া উঠিল তাহার মুখখানি একেবারে শাদা হইয়া গেল।

আট দিন পরে বিদ্বান স্বামী অঘোরনাথের সহিত শিখরবাসিনী পিতৃগৃহে ফিরিল।

পর দিন মধ্যাহ্নে শিখরবাসিনী তাহার পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাবা আমি যাব না।" সেই দিন অপরাহ্নেই তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে।

পিতা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, "ছি মা ওকথা কি বলতে আছে। শ্বশুর বাড়ীই যে তোমার নিজের বাড়ী—এবাড়ী যে তোমার পরের বাড়ী হ'য়ে গেছে মা। দু'দিন পরে তুমিই এখানে আসতে চাইবে না।"

পিতার এই প্রবোধবাক্যে শিখরবাসিনীর কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে পিতার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "মেয়েকে খুব আদর দাও। আমি জানি ও শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় এই রকম করবে। যাবে না বল্লেই হ'ল!"

পিতা কোন কথা না বলিয়া কন্যাকে সস্নেহে তুলিয়া তাহাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

শিখরবাসিনীকে যাইতে হইল। স্বামীর গৃহে তাহার আর সুখের সীমা রহিল না; তাহার পর হইতে অঘোরনাথের বন্ধুদ্বয়কে প্রায় সব সময়েই অঘোরনাথের শয়নগৃহে দেখা যাইত এবং তাহারা অঘোরনাথকে শাসাইয়া যখন গৃহত্যাগ করিত, শিখরবাসিনীর দেহের উপর দিয়া অঘোরনাথ তাহার প্রতিশোধ লইত।

মাসখানেক পরে সাত দিনের কড়ারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। দিনকয়েক পরে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন।

ঠান্‌দিদি সম্পর্কীয়া একজন বর্ষীয়সী রমণী শিখরের চিবুক ধরিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া কহিল, "কি লা এমন কাল রোগা হয়ে গেছিস্ কেন লা, বর বুঝি খেতে দেয় না?"

শিখর কোন উত্তর দিল না। টগর নিকটেই ছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "খেতে দেয়না কিগো ঠাকুরমা—অমন খাওয়ার ঘটা অমন খাওয়ার ব্যবস্থা আমি কোথাও দেখিনি।

ঠান্‌দিদি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "হ্যালা শেখর, বর বুঝি খুব বেশী আদর করে?"

শিখর এবারও কোন উত্তর করিল না। করুণ নয়নে একবার ঠান্‌দিদির মুখের পানে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

এমন সময় একছড়া নূতন হার লইয়া ছুটিতে ছুটিতে সেখানে আসিয়া দুর্গারাণী কহিল, "দিদি, জামাইবাবু তোমার জন্য কেমন হার এনেচে দেখ—তোমার গলায় পরিয়ে দিতে বল্লে।"

চারিদিক হইতে পাড়ার মেয়েরা এই নূতন গহণা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। শিখরের জননীও আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিখর স্বামীর নিকট হইতে আরও পাচখানা দামী গহনা পাইয়াছে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল, শিখরবাসিনীর মত এমন সৌভাগ্য হাজারের মধ্যে একটী হয় কিনা সন্দেহ। জননীর দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিল। শিখরের দুই সমবয়সী

নববিবাহিতা আত্মীয়া এবং তাহাদের জননীর মুখ সহসা ভারি হইয়া উঠিল। শিখর দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, এসব গহনার কদর্য্য ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

মাস দুই পরে তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে আসিয়া চমকিয়া উঠিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে, একেবারে চেনা যায় না যে! গায়ে ও সব দাগ কিসের?"

শিখরবাসিনীর দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

শ্রীধর কহিলেন, "আজই তোকে আমি বাড়ী নিয়ে যাব মা।"

শিখর কাতর নয়নে নিঃশব্দে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু পিতাকে অপমানিত লাঞ্ছিত ব্যথিত হইয়া একাকীই ফিরিতে হইল; এই প্রত্যাখানের আঘাত পিতার অন্তরে দারুণ বাজিল। তাহার স্বামী স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল, "বাপের বাড়ী ফেলে রাখবার জন্যে ত বিয়ে করিনি। মেয়ে নিয়ে যাবার কথা ভুলে যান। আপনার মেয়েটী ভারি অবাধ্য, যাতে কথা শোনে তাই বলে যান।" চলিয়া যাইবার সময় পিতা কন্যার সহিত আর দেখা করিতে পারিলেন না!

অঘোরনাথ বীরদর্পে পত্নীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "বাবাকে চিঠি লিখে আনান হয়েছিল? আমি তার খাই না পরি যে তাকে ভয় করব। কেমন অপমানিত হ'য়ে বেরিয়ে যেতে হ'ল। ফের যদি বজ্জাতি করিস, গুনে পঞ্চাশ জুতো মারব।" এই বলিয়া জুতাশুদ্ধ এক লাথি মারিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পাশের বাড়ীর এক সমবয়সী বধূর সহিত শিখরবাসিনীর খুব ভাব হইয়াছিল। প্রতিদিন বৈকালে আসিয়া সেই বধূটি শিখরবাসিনীর চুল বাঁধিয়া দিয়া যাইত। পরিপাটিরূপে সাজসজ্জা না করিলে শিখরের আর রক্ষা থাকিত না। সে দিন বধূটি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, "তোমার মত এমন কপাল কারু হয় না। আমি ত ভাই দিনে কোন দিন তাঁর দেখাই পাই না। এত রাত্তিরে এসে শোন যে অর্দ্ধেক দিন আমি ঘুমিয়েই পড়ি।"

শিখরবাসিনী অন্তরের তীব্র ব্যথা চাপিয়া কহিল, "খুব মার খাও ত?"

সুখলতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কার কাছে মার খাব ভাই?"

শিখর কহিল, "কেন তোমার স্বামীর কাছে।"

সুখলতা কহিল, "দূর তাই নাকি মারে, আমি যে দিন জেগে থাকি তিনি কত আদর করেন।"

"শুধু একলা!" বলিয়াই হঠাৎ শিখর থামিয়া গেল। তাহার চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। সে মুখ নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সবন্ধু স্বামীর আদরের সমস্ত চিত্রগুলি তাহার মানসপটে আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল, যখন সে স্বামীর

বৃদ্ধুয়ের জলন্ত আলিঙ্গন হইতে নিজেকে জোর করিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া পাগলের মত ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিত, আর তাহার স্বামী চুলের মুটি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে শয্যার উপর আনিয়া ফেলিত,—"ওগো আর পারিনা আমায় ছেড়ে দাও" বলিয়া সে আকুল হইয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিত, কিন্তু নিরাশ হইয়া চোখ বুজিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অন্তর্যামীকে কাতরে ডাকিয়া বলিত "ওগো ঠাকুর দয়া কর, দয়া কর।"

উমারাণীর কণ্ঠ যেন আপনাআপনি রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে থামিলে প্রভাবতী চোখ মুছিয়া কহিল, "তুমি এতও জান দিদি। এ রকম স্বামীও থাকে!"

উমারাণী কোন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

(খ)

অঘোরনাথের ভগিনী হরিমতি মাঝে মাঝে তাহার বাড়ী আসিয়া থাকিত। তাহার অবস্থা ভাল ছিল না, অঘোরনাথ তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। দাদার বিবাহের সময় হরিমতি দিন দুই থাকিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এইবার মাস দুই দাদার ভবনে কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া সে আসিল।

হরিমতি একদিন অঘোরনাথকে কহিল, "যত ঢিল দেবে ততই বেড়ে যাবে।"

অঘোরনাথ কহিল, "এমন ঢিলই বা কি দিই। লাথি জুতো খায়, তবুও সায়েস্তা হয় না।"

হরিমতি কহিল, বউটা ত আচ্ছা নেকী! এত দিন বিয়ে হয়েচে, এখনও বুঝতে পারলে না, এ সব ধন-দৌলত এ সৌভাগ্য কাদের জন্য। যাক্ যখন বুঝলেই না তখন "আমি যা বলি তাই কর দিকি দাদা, দেখবে দু'দিন ঢিট্ হয়ে যাবে।"

অঘোরনাথ উৎসাহভরে কহিল, "কি কি বল্ দিকি। তোরা মেয়ে মানুষ, তোরাই ভাল বুঝবি।"

হরিমতি কহিল, "বউয়ের দুই হাত ও দুই পা খাটের সঙ্গে বেঁধে ফেলে রাখলেই সব গোল চুকে যাবে।"

অঘোরনাথ মহা সুখী হইয়া কহিল, "ঠিক ব্যবস্থা করেচিস। এবং এ বুদ্ধি কি পুরুষ মানুষের মাথায় আসে।"

শিখরবাসিনী পাশের ঘরে বসিয়া ভ্রাতাভগিনীর সমস্ত কথা শুনিল। জানালার একটী গরাদে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রহ্মদেশের উপাসনা স্থান আলোক চিত্র হইতে
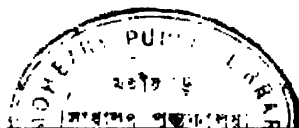
অঘোরনাথ চলিয়া গেলে শিখর হরিমতির পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "তুমিও ত মেয়েমানুষ ঠাকুরঝি।"

হরিমতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "আমিত হুড়্কো নই, পুরুষমানুষের মন জুগিয়ে চল্‌তে তোমার মা শিখিয়ে দেয় নি ?"

শিখর পা ছাড়িয়া তীরের মত সোজা হইয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সকালবেলা বন্ধন খুলিতে খুলিতে হরিমতি ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিল, "কেমন, তেজ ভাঙ্গল! বলি হ্যাঁ লা বউ তুমি নাকি ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাও। কত ঢলানেপনাও জান। গয়না কাপড় দেবার ত কসুর নেই; তবুও তোমার মন ওঠে না।"

শিখর তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "ওরকম গয়না তুমি জন্ম জন্ম পর ঠাকুরঝি।

দিন সাতেক পরে দুইদিন অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার পর শিখরবাসিনী তাহার অবশ হাতদুখানি দিয়া চোখ মেলিয়া পিতাকে দেখিয়া সে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিল।

পিতা কহিলেন, "মা আর তোকে এখানে রেখে যাচ্ছি না, আজ যেমন ক'রে হয় তোকে নিয়েই যাব।"

খানিক পরে হরিমতি কহিল, "নিয়ে যান্, কিন্তু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন। একলা থাক্‌তে দাদার কষ্ট হয়।"

শ্রীধরবাবু কোন রকমে ক্রোধ চাপিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। তখনই কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন। শিখরবাসিনী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করে খবর পেলেন বাবা ?"

পিতা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "পাশের বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আমাকে দয়া করে খবর দিয়ে এসেছিলেন মা ?"

শিখর বুঝিল সুখলতার স্বামীই তাহার পিতাকে সংবাদ দিয়াছেন। শিখর ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "বাবা তুমি না এলে এবার আমি ঠিক মরে যেতাম। আর তুমি আমায় ওখানে পাঠিয়ো না বাবা।"

পিতা দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন, "আবার! তোর কোন ভয় নেই মা।"

উমারাণী থামিল। প্রভাবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ছি ছি কি ঘেন্নার কথা। তুমি ঠিক কথা লিখেচ দিদি মেয়েরাই মেয়েদের ওপর বেশী অত্যাচার করে। যেমন তোমার হরিমতি। ওরকম মেয়েমানুষদের ধরে চাবুক মারতে হয়। তারপর হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদি তুমি শিখরকে বুঝি এইবার মস্ত বড় সতী করে খাড়া করবে। আয়োজন ত তার বেশ ঘন করে এনেছে। অত্যাচারের চূড়ান্ত দেখিয়েছ। এখন হতভাগা লোকটার, শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে বার-

বার মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে ঘটা করে প্রণাম করাটাই যা বাকী! তুমি নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করবে; আমি কিন্তু তা করতাম না দিদি।"

উমারাণী হাসিয়া লইল। "তুমি কি করতে শুনি?"

প্রভাবতী কহিল, 'আমি ঠিক যে কি করতাম তা না ভেবে বল্‌তে পারচি না। কিন্তু আদর্শ সতী গড়ে তুলতাম না একথা আমি বল্‌তে পারি। আচ্ছা তুমি পড় দিদি, শেষটা কি করেচ শুনি।"

উমারাণী আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

(গ)

মাসখানেক পরে অঘোরনাথ পত্নীকে লইতে আসিল। শ্রীধরবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। শিখরের জননী জামাইয়ের জন্য চব্য চোষ্য লেহ্যপেয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। খাবারের রেকাবি সাজাইয়া জননী কন্যাকে কহিলেন, "খাবার দিয়ে আয়,—দাঁড়িয়ে রইলি যে, জামাই কতক্ষণ এসেছে—একেই আমার খাবার সাজাতে দেরী হ'য়ে গ্যাছে আবার তুই আরও দেরী করে দিচ্ছিস্—ওমা এমন এমন মেয়ে ত কোথাও দেখি নি।"

শিখরবাসিনী তবুও নড়িল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। অঘোরনাথের চরিত্রের বীভৎসতা স্মরণ করিয়া সে শক্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। জননীর উপদেশ, অনুরোধ, তিরস্কার কিছুতেই সে কর্ণপাত করিল না।

"এমন মেয়ে ত কোথায় দেখিনি" বলিয়া জননী নিজেই মাথার অঞ্চলটা একটু টানিয়া দিয়া জলখাবারের রেকাবি লইয়া বাইরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীধরবাবু সবেমাত্র কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। অঘোরনাথকে দেখিয়া তিনি দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পাজি নচ্ছার বের আমার বাড়ী থেকে।" তারপর পত্নীর দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আদর করে খাবার খাওয়াতে এসেছ। বাড়ীতে ঝাঁটা ছিল না।"

অঘোরনাথ বেগতিক বুঝিয়া ঘরের বাইরে গিয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে শাসাইয়া গেল, "আমার স্ত্রীকে আট্‌কান বের করচি, পুলিশ ডেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাব, তবে আমার নাম অঘোরনাথ।"

শ্রীধর কহিলেন, "তোকে যে এখনও পুলিশে দিই নি, এই তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফের একটা কথা বল্‌বি ত জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।"

আজ ত শিখরবাসিনীর কত কথাই মনে উদিত হইতে লাগিল। শিশুকাল হইতে সে

শুনিয়া আসিতেছে স্বামী স্ত্রীর দেবতা। যতদিন তাহার এ দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঐ দেবতাটির এক করুণাময় উজ্জ্বল মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেবতাকে যেদিন প্রথম স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিল সেইদিনই তাহার কল্পনা গঠিত মূর্ত্তিখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। স্বামীকে দেখিলেই যে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। এই দেবতাটির কুৎসিৎ প্রস্তাব হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য কাতরে সে অন্তর্য্যামীকে ডাকিত। এই কি তাহার ভক্তিভাবে শিবপূজার ফল! আজ একবার সে আত্মসমাহিত হইয়া অন্তরের মধ্যে স্বামী দেবতার সন্ধান করিল; কিন্তু দেবতার সন্ধান ত মিলিল না। পত্নীর দেহ বিক্রয় প্রয়াসী এক পশুর চিত্র তাহার সমস্ত কদর্য্যতা লইয়া তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিল। এমনই ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন তাহার স্বামী সংবাদ পাঠাইল যে অবিলম্বে শ্রীধর যদি তাহার কন্যাকে পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে সে আর ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে না -এবং আর একটী বিবাহ করিয়া তাহাকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিবে।

জননী শঙ্কিত হইয়া চুপি চুপি কন্যাকে কহিলেন, "আমি বল্‌লে উনি শুন্‌বেন না, তুই গিয়ে ওঁকে বল, উনি যেন এখনই তোকে রেখে আসেন। পুরুষমানুষের কি, সে না হয় আর দু'টা বিয়ে করবে, কিন্তু তোর দশা কি হ'বে বল দিকি?"

শিখরবাসিনী এতদিন মুখ ফুটিয়া তাহার জননীকে কিছু বলে নাই, কিন্তু আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, "মা তোমার মেয়ে ত বেশ্যা নয়" আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ক্ষোভে অপমানে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

জননী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন অনাসৃষ্টি কথা ত তিনি কোনদিন শোনেন নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, "তোর কি সবাই ক্ষেপেছিস্। ওঁকে বল্লে উনি বলেন তোমার মেয়েকি বেশ্যাবৃত্তি করতে জামাইবাড়ী যাবে। এ সব কি কথা!"

শিখরবাসিনী বুঝিল, জননী তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পিতা দেবতা, জননী দেবতাই দেখিয়া আসিয়াছেন। স্বামী, স্ত্রীর সর্ব্বস্ব হইলেও যে পশুর অপেক্ষা অধম হইতে পারে, এ যে তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া সে তাঁহাকে বুঝাইবে। তীব্র অন্তর্জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহার জননীকে যাহা সে এইমাত্র বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বেশী আর কিছু সে বলিতে পারে না।

একমাসের মধ্যে অঘোরনাথ আর এক হতভাগিনীকে পত্নীরূপে গৃহে আনিল। সেই কন্যার পিতা জানিয়া শুনিয়াই প্রায় দুই সহস্র টাকার অলঙ্কার দিয়া কন্যাকে পারস্থ করিলেন। পুরুষ যে কোন অন্যায় কাজ করিতে পারে এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শিখরবাসিনী অবাধ্য, অশিক্ষিতা, সে পতির মন যোগাইয়া চলিতে পারে নাই, কাজেই অঘোরনাথ তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইহাই নূতন বধূর পিতার বিশ্বাস এবং ইহাই তিনি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেও কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

শিখরবাসিনীর জননী কন্যার এই অতিবড় দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। এই দুর্ঘটনার জন্য তাঁহার স্বামী ও কন্যাই যে দায়ী এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। একদিন পাড়া প্রতিবেশীরাও শিখরবাসিনীর উদ্দেশ্যে নানা কথা বলিতে লাগিল।

* * * * * * *

সেদিনের কি সুন্দর রাত্রি। তিমির নিশীথিনীর নক্ষত্রপুঞ্জ এক একটী দেবতার রূপ ধরিয়া পুষ্পচন্দনহস্তে উজ্জল মূর্ত্তিতে সারা আকাশকে শোভাময় করিয়া কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বর্গের পরীরা লাজ বর্ষণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ধরণীর দিকে চাহিয়াছিলেন। এমনই সুন্দর রাত্রে পিতা স্বয়ং শেঁকো বিষের ব্যবস্থা করিলেন।

প্রভাবতী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "সে হতে পারে না! পিতা কন্যাকে বিষ খাইয়ে মারবে, আর বিনাদোষে!"

উমারাণী হাসিয়া কহিল, "যখন আর কোন উপায় থাকেনা, তখন এই রকম শেঁকো বিষেরই ব্যবস্থা করতে হয়;—তাতে সুফলও ফলে থাকে বোন্।" তার পর একটু থামিয়া আবার—"শেঁকো বিষে দুই একজন বেঁচেও যায় বোন্।"

প্রভাবতী হাল্‌কা মনে কহিল, "তাই বল দিদি শিখরকে আবার বাঁচিয়েছ। বিষ খেয়ে সে মরে নি?"

উমারাণী কহিল, "না মরেনি, পুরুষের অত্যাচারে বিনাদোষে কত হতভাগিনী এইভাবে লাঞ্ছিত হয়ে, হয় আত্মহত্যা করে, নয় সারাজীবন জলেপুড়ে মরে, শিখরেরও সেই অবস্থা হ'ত, কিন্তু এক দেবতা দয়া করে তাঁকে পায়ে স্থান দিলেন।

প্রভাবতী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি গো! শিখর পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। না দিদি এ লেখা তোমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে।"

উমারাণী কহিল, "দূর বেরিয়ে যাবে কেন!"

প্রভাবতী কহিল, "তবে?"

উমারাণী কহিল, "এক দেবতা তাকে যথা নিয়মে বিয়ে করলেন।"

প্রভাবতী বলিয়া উঠিল, "হিন্দুর মেয়ের নাকি দু'বার বিয়ে হয়,—তুমি এ কি ছাই লিখেচ!" উজ্জল মুখে উমারাণী কহিল, "এ যে সত্যি কথা বোন্। সেই জন্যই আমার দেবতা আর আমি আজ খ্রীষ্টান। আমার শ্বশুর আর বাবা দাঁড়িয়ে থেকে এ বিয়ে দিয়েছেন।"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

আলো ও ছায়া — আলোক চিত্র হইতে
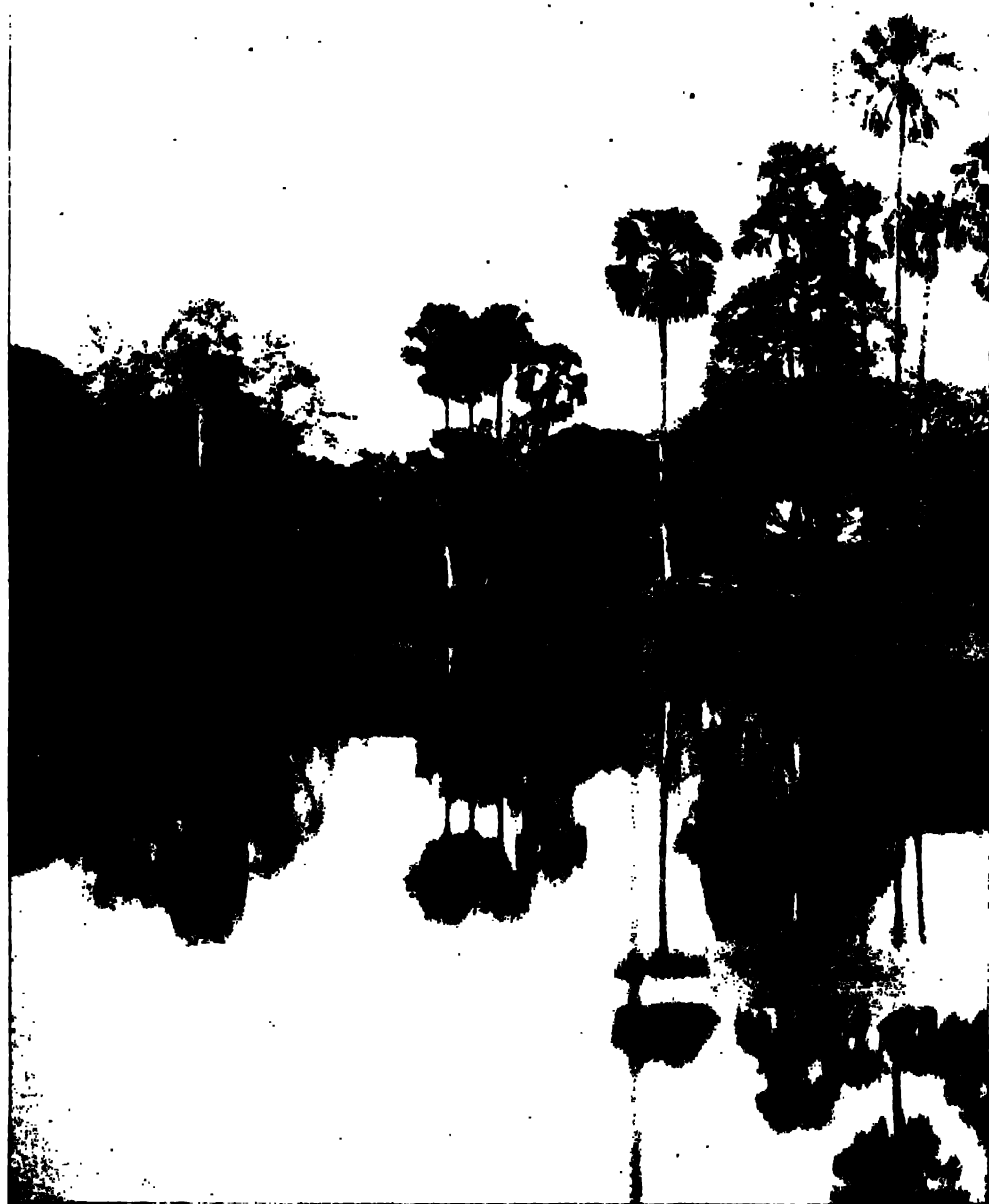
হার-জিত

নলক নেড়ে বললে প্রিয়া   হাতটী হেসে ধ'রে
"শোন কথা,—আজও যদি   রাগাও তেমনি ক'রে
ক'বই নাকো কথা।"

আমি কিন্তু রাগিয়ে দিয়ে   বললাম তারে হেসে,—
"ভেবো নাকো আমিই আগে   কইব কথা, শেষে
কি-ই বা মাথা ব্যথা।"

প্রিয়া আমার ভেবেছিল   রোজই যেমন করি
আমিই আগে ভাঙ্গাবো রাগ   তুলবো হাতে ধরি
কইব কথা হেসে।

সেদিন কিন্তু রইল কথা   বন্ধ একেবারে
উভয়েরই ভাবনা মনে   কে জেতে কে হারে
দেখাই যাবে শেষে।

হ'য়েছিল একটু খানি   বৃষ্টি সেদিন সাঁঝে
ভিজে মাটীর গন্ধ নিয়ে   তাইতে মাঝে মাঝে
এল বাতাস মন্দ।

ঘুমের ভাবে পড়েছিনু   শ্বাসটা চেপে জোরে
সেও যে ঠিক তেমনি ক'রেই   ঠ'কাচ্ছিল মোরে
ছিলই নাকো সন্দ।

হঠাৎ মেঘের গরজনে   ছুটে এসে কাছে
জড়িয়ে আমায় হাঁফটা ছেড়ে   ভবে প্রিয়া বাঁচে,
বললে "পায়ে পড়ি

কওনা কথা, মেঘের ডাকে   কাঁপছে আমার দেহ
এমন নিঠুর লোক ও কভু   দেখেনিকো কেহ
ভয়ে যে আমি মরি।"

বুকে টেনে বললাম হেসে   চিবুক ধ'রে তার,
"এতদিনে জিতলাম আমি   আজকে তোমার হার।"

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ধরি মাছ না-ছুঁই পানি

ব্যঙ্গ-চিত্র।

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।
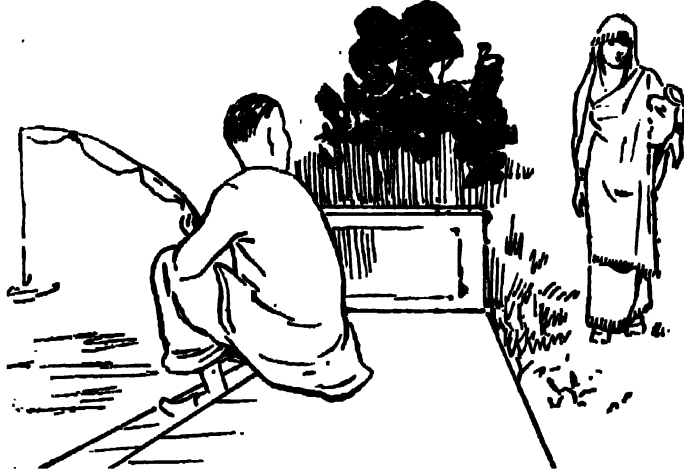
লম্বা ছুটি পেয়ে বাবু শ্বশুরবাড়ী এসেছেন—জনৈক প্রতিবাসীর পুষ্করিণীতে মাছ (কি মাছ তা জানে না) ধরিতে বসিয়াছেন। জলার্থিনী বাবুরই পত্নী—যিনি মনে মনে ভাবেন যে এমন পত্নীগতপ্রাণ স্বামী আর নাই।

বসনাবৃত সুন্দরীকে দেখিয়া বাবু একটু গা-ঢাকা হইলেন তবে দেখাটা বন্ধ রহিল না। তাহার সতৃষ্ণ চাহনী দেখিয়া পত্নী ভাবিলেন "কি গভীর ভালবাসা! আমরি মরি!"

রমণীকে (অপরের স্ত্রী ভাবিয়া) বাবু মনে করিলেন "হুঁ, হুঁ, শিকার লেগেছে—লাগ্‌বে না, কি চেহারা-খানা ?"

রমণী যখন পিছন ফিরিয়া চুল ঝাড়িতে ছিলেন, বাবু শিকারটী উত্তমরূপে গাঁথিবার জন্ত আবার ছিপ ফেলিতে বসিলেন।

ছাঁচ মারিতেই রমণীর বসনে বঁড়শী বিঁধিল—

"এঁ্যা—এযে আমারই তিনি—কি কল্লুম, ধরা পড়িয়
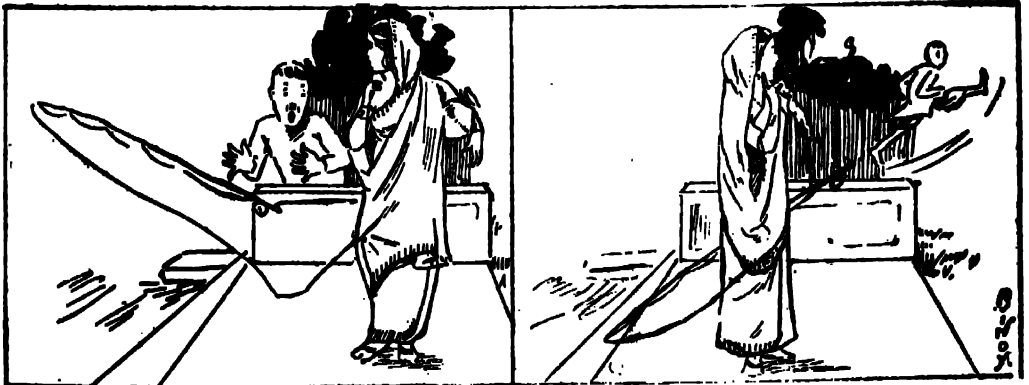
ব্যর্থ-সাধন

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুজং দিয়াছে।

লোকটা ছিল বেশ, খাচ্ছিল দাচ্ছিল করছিল কর্মাছিল হঠাৎ কি ভূত কেমন করিয়া যে ঘাড়ে চাপিয়া বসিল তাহা বুঝিতে তাহার স্ত্রীই অক্ষম হইল, অন্যের কথা আর কি বলিব? ঘটনাটা কি তোমরা শোন।

সাতকড়ি গবর্ণমেণ্টের কোন একটা আফিসের কেরাণীগিরি করিত, গুটি তিনেক ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী লইয়া হাটখোলায় একটা দ্বিতল বাড়ীর আধখানায় বাস করিত। অল্প বেতন, স্ত্রী পুত্র লইয়া আলাদা একটা বাসা লইয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না, তাই আর একজনদের সঙ্গে, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সাতকড়িকে থাকিতে হইয়াছিল। সাতকড়ি ইহাতে যে খুব বেশী অসুখী ছিল এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না, তবে এই বন্দোবস্তে সাতকড়ি-পত্নী সুমতির আদৌ মন উঠিত না। সে বেচারী চাহিত, আপনার স্বামী পুত্র লইয়া বেশ একটু নিরিবিলিতে, নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করে, এবং মনোভিলাষ সে বহুদিন বহু প্রকারে সাতকড়ি গোচর করিয়াছিল। সাতকড়ি এ সকল কথা কাণেই তুলিত না; যখন তাহার স্ত্রী কথাগুলিকে তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য কণ্ঠ সপ্তমে তুলিত এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া সাতকড়ির মন ভিজাইবার চেষ্টা করিত তখন শ্রীমান সাতকড়ি অকস্মাৎ আফিসের সময় উত্তীর্ণ প্রায় বলিয়া নিরুপদ্রবে বাসা ত্যাগ করিয়া যাইত, কখনও কখনও দুই তিন দিন ফিরিত না। প্রথম প্রথম সুমতির পক্ষে এই অনুপস্থিতিটা বড়ই তীব্র বোধ হইত, ইদানীং তাহার সকলই সহ্য হইয়া গিয়াছে।

সাতকড়ির স্বভাব ছিল, লোকে বলিত ভারি মৃদু। তাহার স্ত্রী ও যে তাহা অস্বীকার করিত তা নয়, তবে কথাটাকে সে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিত। তাহার মতে সাতকড়ি ছিল আস্ত একটা "ভিজে-বেড়াল"। সাতকড়ি এই সম্ভাষণেও আপত্তি করিত না। সকল সময়েই সুমতির তর্জন গর্জনগুলি মুখ টিপিয়া সহিয়া যাইত; বরং সুমতি যে দিন কিছু বলিত না সেই দিনটা তাহার বড়ই অস্বস্তিতে কাটিত। কারণ ইহা সে বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছে, সুমতি যখন শান্তমূর্ত্তি ধরিয়াছে তখনই এমন একটা অসম্ভব রকমের বায়না সে করিয়াছে যে সাতকড়ির তাহাতে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। সেবার সুমতি দিন আটেক ধরিয়া কি পাতিব্রত্য পালনই না করিয়াছিল, তাহার পরই মধু সেকরা একখানি বালির কাগজে, চালচোয়ান কালিতে লেখা ফর্দে সাতকড়ির মাথাটি ঘুরাইয়া দিল। সাতকড়ি ফর্দ খানাকে পকেটে পুরিয়া আফিসে

পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সুমতি হাঁড়ীকুড়িগুলিকে দমাদম্ ভাঙিতে সুরু করিয়া দিল ; ছেলে মেয়ে গুলাকে অফিসে বিবিধ মিষ্টান্ন পাওয়া যায়; এই লোভ দেখাইয়া পিতার অনুগমন করিতে পরামর্শ দিয়া, বাড়ীওলার ছেলেকে বলিল "আমরা উঠে যাচ্ছি, এই বেলা বাড়ীভাড়া যা বাকী আছে, আদায় করে নাও গো। বাড়ীওলার পুত্র মোড়ের মাথায় সাতকড়ির ছাতা চাপিয়া ধরিল। ছেলে মেয়েগুলা ইতিপূর্ব্বেই পিতাকে আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছিল, বাড়ীওলার পুত্র বলিল ছেলে মেয়ে নিয়ে সরছ ভাড়া মিটিয়ে দাও !

সাতকড়ি মূর্খ বাড়ীওলা-পুত্রকে বুঝাইবার বিধিমত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাড়ীওলা-নন্দন ছাতা ছাড়িয়া বস্ত্রাঞ্চলের এমন এক স্থান ধারণ করিল যে কয়েকজন কাবুলিওয়ালাও তাহা দেখিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকা দিল।

সাতকড়িকে বাড়ী ফিরিতে হইল ; সুমতি বাড়ীওলার স্ত্রীকে ইতিমধ্যে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলা যে ঐ লোকটি চেতলায় বাসা করিয়াছে, এখন হইতে সেখানেই থাকিবে ; বাকী ভাড়া যাহা পাওনা আছে, এখন যদি আদায় না হয়, কোন কালেও আর প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না।

বাড়ীওয়ালী সুমতিকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিল ও লোক সব পারে, সব পারে। বউ-ছুঁড়ী একগাছা হার গড়িয়েছে তারই দাম দেবার ভয়ে যে দেশ ত্যাগ করতে পারে, তার অসাধ্য কম্মো নেই। ভাগ্যিস্ তুমি বল্লে বউ মা ! নইলে ত টাকা কটা গেছল বাছা ! পুত্রকে টাকা আদায় করিয়া তবে তাহাকে ছাড়িতে পরামর্শ দিয়া বাড়ীওয়ালী বলিতে লগিল কি সয়তানী বুদ্ধি তা বল বাছা। ছেলে মেয়ে কটার হাত ধরে সরে পড়ছে, জানে বউ-ছুঁড়ী মেয়েমানুষ ওকে ত আর আটকাতে পারবে না, একদিন আনালেই তখন হবে ! ধুকুড়ীর ভেতর খাসা চাল বাছা, খাসা চাল !

সাতকড়ি সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সে যত বলে ফাঁকি দিবার কোন মতলব তাহার ছিল না, পরেও কখন হইবে না। বাড়ীওয়ালী ও তস্য পুত্র ততই তাধিয়া তাধিয়া নৃত্য করে আর বলে, তুমি আর কথা কয়ো না বাছা ! এক গাছা সরু ছিনে-পড়া হার গড়িয়েছে ছুঁড়ী, তারই টাকা দেবার ভয়ে যে লোক দেশ ছাড়তে পারে, সে লোক সব কর্‌তে পারে, তার অসাধ্য কাজ তিরভুবনে নেই !

বাড়ীওয়ালীর পুত্র দুই চক্ষু পাকাইয়া বলিল—তুমি মানুষ খুন করতে পার। তা জান !

সাতকড়ি একা, না সহায়, না সম্পত্তি, স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, জানে !

সাতকড়ির একখানি পোষ্টাফিসের পাস্-বহি ছিল, বোধ করি তাহাতে কিছু টাকাও ছিল, মধ্যাহ্নে খোট্টানি ঝির দ্বারা একখানি টাকা তুলিবার ফারম আনাইয়া টাকা তুলিল ; বাড়ীওয়ালীর টাকা মিটাইয়া স্যাঁকরাকে ডাকিল ; কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া তাহার দেনা মিটাইয়া দিল।

সুমতি রান্নাঘরে থাকিয়া সব খবর লইতেছিল ; স্যাকরা চলিয়া যাইতেই, সুমতি কন্যাকে

দিয়া সাতকড়িকে ডাকিয়া পাঠাইল। সাতকড়ি এখনি আসিতেছি বলিয়া সেই যে ডুব দিল, তিন দিন তিন রাত্রি তাহার টিকিই দেখা গেল না।

অন্য মেয়ে হইলে কি হইত, কি করিত বলিতে পারি না, তবে সুমতি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; নিত্য যেমন সংসারের কাজকর্ম্ম করিত, খাইত, গল্প করিত, ঘুমাইত, নিয়মিত ভাবে করিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীওয়ালী-মা মাঝে মাঝে লোকটার খোঁজ খবর লইবার চেষ্টা করিতে বলিতে আসিলেন, সুমতি বাড়ীওয়ালীর পুত্র মারফত একখানি "রাজা ডাকাত" উপন্যাস আনাইয়া পাঠে মন দিল ও অম্লানমুখে কহিল—আসবে'খন।

কিন্তু সুমতির আশা-ভরসা এবার নিষ্ফল হইয়া গেল; চারদিনের দিন অপরাহ্নে একখানি পোষ্টকার্ড আসিয়া হাজির, লেখা সাতকড়ির হাতের। শিরোনামায় কন্যার নাম, ভিতরে কাহাকেও সম্বোধন করা হয় নাই, পাঠ্যাংশ একেবারেই লিখিত হইয়াছে। ভাবার্থ এইরূপ:—

অশেষ জ্বালা যন্ত্রনা ভোগের পর শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, অসার অনিত্য সংসারের অসারতা উপলব্ধি হইয়াছে, অতঃপর আমি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এখানে পুরীধামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রধান সেবক দয়ানন্দ মহারাজের নিকট আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি জানিবে। অত্রপত্রে ইহাও জানাইতেছি যে যদি শ্রীগুরু তোমাদের প্রতি কৃপা করেন, প্রভুর প্রতি তোমাদের আসক্তি জন্মে তবেই আমরা আবার মিলিত হইব, জানিবে। আরও জানিবে, আফিসে আমার আট মাস ছুটি পাওনা ছিল, শরীর অসুস্থ লিখাইয়া আট মাসের ছুটি গ্রহণ করিয়াছি। আমার মাহিনার টাকা হইতে প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া সংসারের খরচের জন্য তোমাদের নিকট পৌছিবে। ঠিকানা দিলাম না, পত্রাদি পাইতে আমার ইচ্ছা নাই জানিবে। ইতি—

শ্রী সাতকড়ি দে।

বাড়ীওয়ালী-মা সুমতির মুখের পানে চাহিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া ছিলেন, সুমতি পত্রপাঠ শেষ করিতেই জিজ্ঞাসিলেন ছেলে কি লিখেছে বৌ মা!

সুমতি হাসিয়া বলিল—লিখেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! গৌর কৃপা করেছেন, মন্ত্র নিয়ে পুরীতে আছেন, সংসার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, লিখেছে।

বাড়ীওয়ালী-মার লোল জিহ্বাখানি আধহাত পরিমাণ বাহির হইয়া পড়িল, অ্যাঁ বল কি বৌ-মা! ছেলে আর আসবেন না অ্যাঁ!—বেচারীর বাড়ী-ভাড়ার জন্যই ভাবনা!

সুমতি হাসিয়া বলিল—তুমিও যেমন! গৌর কৃপা করবার আর লোক পেলেন না ত! তাই ওঁকেই কৃপা করে বস্‌লেন!

কিন্তু লিখেছে যে!

ও অমন লেখে!

তবে কি ছেলে যান্ নি?

সুমতি বলিল, যাবেন না কেন,—গেছেন। দু'চারদিন মুখ বদলে আসতে গেছেন।

বাড়ীওয়ালী-মা তথাপি নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না, কহিলেন—গৌর মন্ত্র নিয়েছে বলছ, আমিত শুনিছি বাছা, ও মন্ত্র নিলে আর সংসারে থাকে না। ঐ আমার বড় মেয়ের ননদের এক মাসী :--

মন্ত্র আজ নতুন নেয় নি মা! ও সব বুজরুকী বিয়ের পর থেকেই ছিল। টাকা কড়ি চাইলে কি ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড়ের কথা বল্লেই অমনি ঝুলি টেনে চোখ বুজে বসতেন—গৌর কৃপা করেছেন! কৃপানিধি কৃপা করবার ঐ একটি লোকই পেয়েছিলেন

সুমতির রাগটা যেন সব গৌরের উপরই গিয়া পড়িল।

বাড়ীওয়ালী-মা'র নিঃশ্বাসটুকুও পড়িতেছিল না। চিঠিতে যে ক'টি কথা লিখিয়াছে, যদি তাহা সত্য হয়, তবে ত এ ভাড়াটে পোষায় আর কোন সুখ নাই। আবার বাড়ীর মধ্যে নূতন ভাড়াটে ঢোকানও ত সহজ কথা নয়, কচি কাচা বৌ-ঝি! ইহারা একরকম অনেকদিন ছিল,—আর পুরুষটির—সত্য বলিতে কি —অন্য কোন দোষ, এমন কি চোখেরও দোষটি ছিল না! দোষ গুণ বলিতে হইবে বৈ-কি! কিন্তু এখন যে সমূহ বিপদ।

বাড়ীওয়ালী-মা বলিলেন—তাহলে বৌ-মা বোধ করি বাপের বাড়ী যাবে?

না না! এখানে থাকবো! মাইনের টাকা আমার কাছেই আসবে, আপনার কোন ভয় নেই মা!

না, না ভয়ের কথা আমি কি বলছি—তুমি যে আমার লক্ষ্মী-মেয়ে বাছা! মাইনের টাকাটা তাহ'লে—তাই ত বলি, সাতকড়ি লোক ত নিন্দের নয় তবে কি জান মন্ত্র তন্ত্রটা একটু বেশী বয়সে নিলেই ভাল হ'ত।

গৌর যে কৃপা করেছেন!—সুমতি চিঠিখানাকে বাক্সে রাখিতে রাখিতে খুব হাসিল; মনে মনে বলিল—কে ভুজং দিয়েছে আর কি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃপানিধির কৃপা

সুমতি মিথ্যা বুঝিয়াছিল, এবার সত্য-সত্যই কৃপানিধির গৌর সাতকড়ির প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। সাতকড়ি শ্রীশ্রীপুরীধামের মাঠে আসিয়া দীক্ষা লইল; প্রকাণ্ড তুলসীর মালা পরিল, খোল করতাল বাদন শিক্ষা করিল, দু'হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে শিখিল; অষ্ট প্রহরে অষ্ট ভোজ করিতে অভ্যস্ত (প্রথম প্রথম একটু পেট খারাপ হইয়াছিল, গুরু-ভাইদের কাছে পল্‌সেটিলা ছিল, কয়েক ফোঁটা খাইয়া সে এক ঘুম দিয়া সুস্থ হইল।), গুরুভাই জুটিল অনেক,

গুরু-ভগ্নীও গুটিতকতক জুটিল, সাতকড়ির আনন্দ আর ধরে না। মঠে সাহেব নাই, স্ত্রী নাই, বুটজুতা নাই, অলঙ্কারের বায়না নাই, ছেলেমেয়েদের অসুখবিসুখ নাই, অফিসের বড় বাবুর রক্ত-আঁখি নাই, সুমতির তর্জন গর্জন নাই একমাত্র সমুদ্র-গর্জন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সাতকড়ি গোটাকতক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মঠে মন বসাইয়া ফেলিল। যে গুরু-ভাইয়ের অনুগ্রহে সাতকড়ি কৃপানিধির কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিল, যিনি গাঁটের পয়সা বাহির করিয়া সাতকড়ির টিকিট কাটিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার সুপরামর্শে সাতকড়ি সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারিয়াছিল, সাতকড়ি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া শেষ করিতে পারে না। গুরু-ভাইটিও সর্বস্ব ধন, যশঃ মান, প্রাণ সব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, ধন্যবাদের প্রত্যাশা বড় রাখেন না। সাতকড়ি ধন্যবাদ দিবার উদ্যোগ করিতেই তিনি কাণে আঙুল দেন, বলেন—কর্ত্তব্য করেছি ভাই, ধন্যবাদ কিসের ?

বড় মহারাজ - মঠের অধ্যক্ষ, কহিলেন—সাতকড়ি, তোমাকে যেমন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া তুমি ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছ, এই অনিত্য সংসারে তোমার মত পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট কত অভাগা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তুমি যদি তাহাদের মুক্তির এমনই উপায় করিয়া দিতে পার, তবেই তোমার আসল কর্ত্তব্য করা হইবে।

বড় মহারাজের চেহারাটা যেমন স্থূল, তেমনই হৃষ্টপুষ্ট, মুখের কথা নয় ত—যেন অমৃত। সাতকড়ির হৃদয়ে কথাগুলি গাঁথা রহিয়া গেল। সাতকড়ি মন্ত্রের সাধনাদ্দেশে হৃদয় মন নিয়োজিত করিল। কি উপায়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইল বলিতেছি ; সেদিন অপরাহ্নে সমুদ্র-সৈকতে বেড়াইতে গিয়াছিল—গিয়া দেখিল, জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক কতকগুলি ছেলে-পুলে লইয়া বালির চড়ায় বসিয়া আছেন। সাতকড়ির মনে 'কৃপা' জাগিয়া উঠিল, আহা, জাগিবে না ! লোকটি অতগুলি ছেলে-পুলের পিতা নিশ্চয়ই পিতা—ওঃ উহার কি কম কষ্ট ! সাতকড়ি আলাপ করিয়া ফেলিল ভদ্রলোক একদিন শীঘ্রই মঠ দেখিতে আসিবেন স্বীকৃত হইয়া, সন্ধ্যাগমে গৃহে ফিরিলেন ; সাতকড়ি 'কৃপা'বশতঃ তাঁহার সহিত বহুদূর গমন করিল, শীঘ্র একদিন মঠ দর্শন করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানাইয়া মঠে ফিরিয়া আসিল।

ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড সব-জজ, গত পয়লা জানুয়ারীতে রায় বাহাদুর হইয়াছেন ; জীবনের শেষ কটা দিন ৺ধামে কাটাইবার মানস করিয়া স্বর্গদ্বারের নিকট একটি বাঙলা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন ; প্রত্যুষে প্রত্যহ সমুদ্র স্নান ও 'দর্শন' করিয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে পাণ্ডা-ব্রাহ্মণ ভোজন করান, দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি। একদিন সস্ত্রীক মঠ দর্শনে আসিলেন। সাতকড়ি বড় মহারাজের নিকট তাঁহাদের হাজির করিয়া দিল ; বড় মহারাজ অমৃতবাণী সিঞ্চনে রায়বাহাদুরের আইন-কঠোর প্রাণটিকে ভিজাইয়া দিলেন ; গৌরচন্দ্রের কৃপাবলেই যে তাঁহাকে এখানে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তাহাও কম-করিয়া দশবার জানাইয়া কহিলেন—আপনারা প্রত্যহ আসিবেন। গৌরচন্দ্রের কৃপায় আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

ছেলের দল আলোক চিত্র হইতে

রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এম্‌-এ,বি-এল্‌ হইয়া ব্যর্থভাবে ঘরের কড়ি খরচ করিয়া আদালতে আনাগোণা করিতেছিল, রায়বাহাদুর সাহেব সুবাকে ধরিয়া করিয়া একটা মুন্সেফিতে বাহাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, শ্রীমন্দির দর্শন করিতে গিয়া নিত্যই মহাপ্রভুর রাঙা (?) পায়ে মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তিনমাস যাবত করিতেছেন কিন্তু সেক্রেটেরিয়েটের সাহেবদের উপর মহাপ্রভুর প্রতিপত্তির অভাবেই হোক বা পূর্বকৃত পাপের জন্যই হোক, এতদিনেও সুফল কিছুই দেখা গেল না। মঠ হইতে ফিরিয়া স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সোণার গৌরাঙ্গের দ্বারে ধরণা দিয়া একবার দেখা যাইতে পারে!

রমণী হৃদয়ের তারে তারে সুধামাখা গৌর-নাম ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আহা কি-বা নবনীতোপম কান্তি, কি সুন্দর মূর্তি, সোণার গৌরাঙ্গ - সোণার গৌরাঙ্গই বটে! সে রাত্রে রায়-বাহাদুর-পত্নী এক স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিলেন, সত্য-সত্যই গৌরচন্দ্রের কৃপায় পুত্রটি বনগাঁয়ে মুন্সেফ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

প্রাতঃকালে সমুদ্র স্নান করিয়া, স্বামী-স্ত্রী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রায়-বাহাদুর বিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই জনৈক মুণ্ডিতমস্তক মালা-তিলক-কৌপীনধারী বৈষ্ণব একখানি তামার থালা হস্তে উপস্থিত হইল; রায় বাহাদুর একখানি নূতন আন্‌কোরা দশটাকার নোট থালায় রাখিয়া দিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিলেন, আকাশ-বাণী হইল -সাষ্টাঙ্গে! রায়বাহাদুর বিনা দ্বিধায় শুইয়া পড়িলেন। রায়-বাহাদুর-পত্নী একদৃষ্টে গৌরের চাঁদমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে গলবস্ত্রের গাঁট খুলিতেছিলেন, কৌপীনধারী এই ভক্তিমতীর ভক্তির কল্পনা গ্রহণে একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—রায় বাহাদুর-পত্নী গ্রন্থি খুলিয়া একখানি ভিক্টোরিয়ামূর্তি সম্বলিত গিনি নিক্ষেপ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। বড় মহারাজ নিকটেই কোথাও ছিলেন, ইঁহারা উঠিতেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তিগদগদচিত্তে কহিলেন গৌর গত রাত্রে স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন, আপনাদের মনস্কামনা অচিরে পূর্ণ হইবে।

রায়বাহাদুরও তদীয় পত্নী পুনশ্চ আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। বড়-মহারাজ আগামী কল্য তাঁহাদের প্রসাদ পাইবার আদেশ জানাইয়া দিলেন; আর একজন শিষ্য (সাতকড়ির গুরু-ভাই) রাত্রে জয়দেব শুনিতে আসিতে বসিল। সাতকড়ি কিছু বলিল না বটে, তবে পাশে দাঁড়াইয়া, হাত কচলাইয়া সমস্তই সমর্থন করিল।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোগের সময় সাতকড়িকে সাতবাটী পরমান্ন খাইতে হইল, বড়-মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া জনৈক বালক গুরুভাই সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম দিনের পরমান্ন-ভোগের দুর্ভোগের কথাটা সাতকড়ি ভুলিতে পারে নাই, সাত বাটী খাইতে ইতস্তত করিতেছিলেন, বড়-মহারাজের আদেশ হইল, তোমার প্রতি গৌরচন্দ্রের অশেষ কৃপা বর্ষিত হইয়াছে, নির্ভয়ে সেবা করিতে পার।

তিনদিন পরে, একদিন সকালে রায়বাহাদুরের বাঙালী ভৃত্য, তিনটা উড়িয়া ভারীর কাঁধে

বাঁক চাপাইয়া নানাবিধ তরী-তরকারী, চাউল, ডাল, মিষ্টান্ন—মঠে আসিয়া দর্শনী দিল ; সাতকড়ি বড় মহারাজকে সুসংবাদ দিতে গেল। বড় মহারাজ ধূলা-সমেত চরণ খানি সাতকড়ির শিরে রক্ষা করিয়া কহিলেন—তোমার মত পুণ্যাত্মা ভক্ত কচিৎ মিলে! আমার কেবল এক দুঃখ, তোমার স্ত্রী-পুত্রগণকে দীক্ষিত করিতে পারিলাম না! তুমি এক কাজ কর সাতকড়ি, তাহাদের এখানে আসিতে লিখিয়া দাও ; আনাইয়া দীক্ষিত করিয়া ফেলিতে পারিলে, তোমার জীবন-জন্ম সফল হইবে।

কিয়ৎপরেই স-পত্নী সপুত্র, সকন্যা রায় বাহাদুর, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রটি একখানি নোট্ দর্শনী দিল—কাল সন্ধ্যাকালে 'তার' আসিয়াছে বঙ্গের লাট সাহেব তাহাকে মুন্সেফীতে বাহাল করিয়াছেন ; প্রথমেই তাহাকে বনগ্রামে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সপরিবারে রায় বাহাদুর মঠের স্থায়ী শিষ্য হইলেন, কিয়দ্দিনপরে তস্য জামাতা, কোথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনিও মঠে আসিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া ধন্য হইলেন।

সাতকড়ির সে কি আনন্দ! গৌরচন্দ্রের কি কৃপা! সাতকড়ি সেদিন আরতির সময় এমন নাচ নাচিল, যে তাহার পায়ের গাঁটটি সকালে গোদে পরিণত হইয়াছে দেখা গেল ; বড় মহারাজের আদেশমত বিকালে তপ্ত বালুতে জানু পর্য্যন্ত বালি চাপা দিয়া বেদনা আরাম করিতে লাগিল।

কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা আজ সাতকড়িকে বড়ই বেদনা দিতেছিল। সাত-সমুদ্রের বালি আনিয়া দিলেও সে বেদনা তাহার প্রশমিত হইত কিনা, সন্দেহ! অহো দুর্ভাগ্য! এত পাপী-তাপী গৌরচন্দ্রের কৃপা পাইয়া তরিয়া গেল! তাহাদেরই কেবল কিছু হইল না!

বড়-মহারাজের কৃপায়, তপ্ত বালুকার গুণে বাহিরের বেদনা সারিয়া গেল কিন্তু অন্তরের বেদনা সারে কৈ ?—সাতকড়ি বিগত তিন মাস একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াও স্ত্রী পুত্রের সংবাদ লয় নাই। আজ লিখিল, পোষ্টকার্ড নয়, খাম, একপাতা আধপাতা নয়-পুরাপুরি আট পৃষ্ঠা! ভক্ত এমনই তন্ময় হইয়া লিখিল যে খাম ভারী হইয়া সুমতির দুই আনা পয়সা ব্যয়িত হইল, সেখানাকে হাতে করিতেই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী সর্ব্বনাশের মূল।

খুব শক্ত মেয়ে বলিয়াই এই কটা মাস সুমতি খুব ধৈর্য্য ধরিয়া সংসার চালাইতে পারিয়াছিল কিন্তু কালের গতির স্বাভাবিক নিয়মই এই, কালস্রোত দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া আনে। সুমতি প্রথম প্রথম চিন্তাটাকে দমন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কথাটা লইয়া বেশী নাড়া-চাড়াও সে করিত না। তাহার এ বিশ্বাস খুব দৃঢ়ই ছিল যে যেখানেই যাক্ সে লোককে কিছুদিন মধ্যে

ফিরিয়া আসিতেই হইবে। যে হেতু বিনা-অর্থে বহুদিন ভোজন করাইবে এমন লোক পৃথিবীতে খুব সহজ-প্রাপ্য নহে। ত্রিশটাকা করিয়া বাড়ীতে আসে, আর কুড়ি বাইশ টাকা সম্ভবতঃ আফিসেই জমা হয় - কারণ যে লোক মঠে আশ্রয় পাইয়াছে সে লোক যে আবার গাঁটের পয়সা খরচ করিবে না ইহা একরূপ জানাই আছে, অধিকন্তু পয়সা খরচ করিয়া বাহিরে থাকাটা সাতকড়িচন্দ্র বাবু যে আদৌ পছন্দ করেন না, সাতকড়ি-চন্দ্র বাবুর গৃহিনীটির সে খবর খুব ভাল রকমই জানা ছিল। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই-চারবার ত দেখা গিয়াছে—সুমতির উপর রাগ করিয়া হোটেলে খাইয়া আফিস করিয়াছে, তিন রাত্রি কাটিয়াছে কি-না কটিয়াছে—গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে আসিয়া বলিয়াছে, জোচ্চোররা তিন দিনেই তাহাকে দেউলিয়া করিয়া দিয়াছে। কাজেই সুমতি যখনই বাড়ীওয়ালি মা'র সহিত সাতকড়ির কথা উঠিত তখনই বলিত, এই দেখ না মা একদিন এসে হাজির হয় আর কি!

হতভাগিনী জানিত না যে গৌর তাহাকে কিরূপ গভীর কৃপা করিয়াছেন। ছার অর্থ, ছার ধনরত্ন—সাতকড়িচন্দ্র সে সব অসার বস্তুর চিন্তাই পরিহার করিয়া ফেলিয়াছে! কাজেই সুমতির দিন গণনা করা ব্যর্থ হইল, সাতকড়ি ফিরিল না, তবুও এই শক্ত-সমর্থ মেয়েটির ভয় নাই, ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই - বেশ সোজাই ছিল, ছেলে মেয়ে গুলিকে পালন করিত, লেখাপড়া শিখাইত, গল্প বলিত, কোলের ভিতর চাপিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তাহার যে কোন দুঃখ আছে, যেন সে নিজেই তাহা জানিত না; কিন্তু সব চেয়ে তার অসহ্য হইল যখন দুই তিন বাড়ির মেয়েরা সান্ধ্য ভ্রমণোদ্দেশ্যে ছাদে উঠিয়া অসীম অনুকম্পার সহিত তাহারই ভাগ্যালোচনায় সন্ধ্যার আসর জমাইয়া তুলিতেন—তখনই কেবল সুমতির গাত্রচর্ম্মে আগুণ ধরিয়া যাইত, বাটনা বাটিতে বাটিতে হাতের নোড়া তাহার শক্ত হইয়া উঠিত, সাতকড়িচন্দ্রের ভাগ্য ভাল, ৩১৬ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।

তিন মাস কাটিয়া গেল, না আসে একখানা চিঠি, না আসে লোক স্বয়ং। এই স্থায়ী রকমের অনুপস্থিতিটা সুমতির কাছে এতই নতুনতর যে সে কোনমতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। দোহাই পাঠিকা রাণী, সাত দোহাই আপনাদের, তাহাকে বড় দুর্বলা ভাবিবেন না; বেচারার দিকে আপনারাও যেন পাঁচী, সাতি' মতির মত অনুকম্পা দৃষ্টিতে চাহিবেন না। সুমতি সামলাইতে পারিতেছিল না বটে কিন্তু বলুন ত মহাশয়গণ 'কৃপা' করিয়া, সে কি সামলাইয়া পরিতেছিল না? রাগ, মহাশয়া, রাগ। তহার কি হইতেছিল জানেন? কোনমতে একটি যদি সঙ্গী পায়, তাহার ইচ্ছা হয়, একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া শ্রীশ্রীধামে আসিয়া একবার দুই চক্ষু মেলিয়া সামনা-সামনি লোকটিকে দেখে, তারপর তাহার গলার মালাটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া দেয়; তারপর শিখাটি কর্ত্তন করিয়া—তারপর, আর কাজ নাই বলিয়া! হিন্দু রমণী সে, তায় আবার জন্মগত অবলা—জানেনই ত, আপনারা, অবলাজনার জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।

ছেলেমেয়েগুলিকে সে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে—পুরী যাবি রে? তাহারা সোল্লাসে বলে—হ্যাঁ মা, যাব। মা আবার জিজ্ঞাসা করে—মঠে যাবি? মালা পরবি? তাহারা স্বচ্ছন্দমনে স্বীকার করে পরব মা! মা বলে—বাবার মালা ছিঁড়ে দিতে পারবি? নির্ব্বিকার চিত্ত বালক-বালিকা তখনই ছুরি কাঁচির সাহায্য লইবে কি-না জিজ্ঞাসা করে!

বাড়ীওয়ালী-মা'র পুত্র কবে কোন-কালে একখানি বাঙ্গালা দৈনিক সম্বাদ ক্রয় করিয়াছিল, তাহার সঞ্চয়ী মাতা তাহারই খানিকটা দেওয়ালের ফাঁকে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন, ঝাঁটা টানিতেগিয়া কাগজখানি পড়িয়া গেল, সুমতি ফেলিয়া দিতে ছিল, হঠাৎ চোখে পড়িল, পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া ৮—২৪; পুরী———সুমতি কাগজখানি হাতে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিল; বহু গবেষণার পর মীমাংসা করিল এইরূপ:—সন্ধ্যা রাত্রে চড়িলে সকালেই পৌছাইতে পারা যায়। বাড়ীওয়ালী-মা রথের সময় গিয়াছিলেন, তিনিই বলেন ভাড়া সাত টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, আর দশপয়সা টিকিট-ঘরে টিকিট কাটানী খরচ দিতে হয়—মোট সাড়ে সাত টাকা; খুকির ও অজিতের হাফ্ টিকিট—সাড়ে সাত টাকা কোলের খোকার টিকিট লাগিবে না—হিসাব করিয়া দেখা গেল, গাড়ীভাড়া মুটে ভাড়া, সর্ব্বসমেত কুড়ি টাকা হইলেই বাহির হইতে পারা যায়। অভাব কেবল সঙ্গীর। বাড়ীওয়ালি-মা তাঁহার ছেলেটিকে সাথী করিয়া দিতে প্রস্তুত, কেবল মুখপোড়া আফিসের লোক ছুটি দেয় না—সেই যা! যা' হোক্—আর একবার সে বাবুদের হাতে পায়ে ধরিয়া দেখিবে, একজনের উপকার হয়, না করিলে চলে কি? তার ভাড়াটা আস্‌টা সুমতিকেই দিতে হইবে, যেহেতু গদাধর বালক মাত্র, পয়সা কড়ি কোথায় পাইবে? আর গদাধরের মা, তিন চারখানি বাড়ীর ভাড়া বাবদ যাহা কিছু পান্, মুন্সীপালের মরা লোকগুলো শকুনির মত উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে ও তাঁহাকে নিঃসম্বল করিয়া দিয়া যায়। সুমতি কুড়ি টাকার উপর আর সাড়ে সাতটাকা ধরিয়া আঙ্গুল আনিয়া দেখিল, সাড়ে সাতাশ, আর আড়াই তিরিশ পূর্ণ হইতে! যাক্—ত্রিশটাকাত এই ক'দিন বাদে মাস কাবারে হাতে আসিবে, অতঃপর দোসরা, তেসরা নাগাদ শ্রীদুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই হইবে। গদাধর আফিসের বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরিতে আদিষ্ট হইল।

ভগবানের কল, সুমতিরও ঠিক এই সময়ে তলব আসিল। না জানাইয়া বিনা সম্মতিতে যাইলে যে একটা কাণ্ড হইবার একটু ভয় সুমতির ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল; সুমতি পূর্ণোদ্যমে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। ছেলেমেয়েদের সমুদ্র দেখাইবে; জগন্নাথের ভোগ খাওয়াইবে, কত কি বলিয়া সান্ত্বনা দেয়। সত্যই একদিন মাসটি কাবার হইয়া গেল এবং নূতন মাসের তেস্‌রাও আসিয়া পড়িল। গদাধরের বাঙ্গালী মনিব হাতে-পায়ে ধরায় ছুটি মঞ্জুর করিয়াছিলেন—গদাধর চন্দ্র দুই 'প্যাক' হাওয়াগাড়ী সিগারেট, চার কুড়ি বিড়ী লইয়া বেতের লিক লিকে ছড়ি হাতে সুমতি ও সুমতির ছেলে মেয়েদের ওয়েটিংরুমে বসাইয়া টিকিট করিতে গেল। মেমসাহেব টিকিট কাটানী খরচটা—না-জানি-কেন—গদাধরের নিকট হইতে আর

প্রকৃতি বিদেশী শিল্পী অঙ্কিত চিত্র হইতে
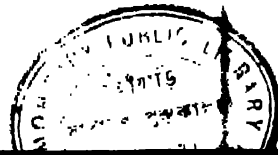
লইলেন না, বোধ করি তাহার বিরাট ভেড়ী ও লিকলিকে বেতের ছড়ি দেখিয়া মেম সাহেব ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। গদাধর ফিরিয়া আসিয়া মাতার নির্বুদ্ধিতা ও নিজের বুদ্ধিমত্তার দুই দফা বিরাট বক্তৃতা দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

যদিও আগমন সংবাদ পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল, পুরী ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিতে দেখা গেল, পরিচিত লোকের নাম গন্ধও নাই। গদাধর বুদ্ধি করিয়া কি-একটা মঠের নাম করিয়া গাড়ীভাড়া করিল, ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া গাড়োয়ান এমন এক স্থানে তাহাদের নামাইতে চাহিল, যেখানকার লোক সাতকড়ির চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় কখনো শুনিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। কি আর করা যাইবে? বেলা যথেষ্ট হইয়াছে, ছেলে-পিলেরা চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া গায়ের মাংস খুলিয়া খাইতেছে, একটা যাত্রী বাড়ীতে উঠিয়া স্নানাহার সারিতে হইল। অপরাহ্ণের দিকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মহাবীর পাড়ায় এক মঠে সাতকড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। সাতকড়ি ইঁহাদের দেখিয়া যথেষ্ট গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। গুরু-মহারাজগণ এ সকল বিষয়ে ইতিপূর্বেই তাহাকে উপদেশাদি দান করিয়াছিলেন। মঠের ভৃত্য বালকৃষ্ণের হেফাজতে ইহাদের অর্পণ করিয়া সাতকড়ি মঠের কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল।

সমুদ্রের ধারে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে বালকৃষ্ণ ইহাদের স্থিতি করিয়া গেল। সেদিন আর রান্নাবাড়ার অবসর নাই, সুবিধাও নাই। সুমতি মঠে যাইবার জন্ত, সেই লোকটিকে চোখোচোখী দেখিবার জন্ত ছটফট করিতেছিল। বালকৃষ্ণ সন্ধ্যার সময় আসিয়া খবর দিল, মঠের নিয়মানুসারে যদিও বহিরঙ্গকে ভোগ-প্রসাদাদি দেওয়া হয় না, তবে প্রভুর 'কৃপা'—পুষ্ট সাতকড়ির পত্নী বলিয়া সুমতিকে ও তাহার পুত্রকন্যা বলিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে অন্তকার রাত্রের মত ভোগ খাইতে দেওয়া হইবে!" সুমতির রাগে কাণ মাথা ভোঁ ভোঁ করিতেছিল, গদাধরকে সে সঙ্গে আনিয়াছে, মঠের পুণ্যাত্মারা তাহাকে যে অপমান করিলেন সে অপমানতো তাহারই। কিন্তু বহিরঙ্গ বস্তুটি যে কি তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, বালকৃষ্ণকে পাণ জর্দা খাইতে দিয়া, তাহার কয়টি বিবাহ, কি সন্তানাদি—খবর লইয়া, জিজ্ঞাসিল—বহিরঙ্গ কাহাকে বলে বালকৃষ্ণ?" বালকৃষ্ণ বোধ্য ও অবোধ্য ভাষার সংমিশ্রণে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই যে মঠের যাহারা শিষ্য নহে, তাহারাই বহিরঙ্গ পদবাচ্য এবং শিষ্যগণকে অন্তরঙ্গ বলা হইয়া থাকে। সুমতি বলিল তোমাদের ঠাকুর মহারাজকে বলগে ঠাকুর, আমিও বহিরঙ্গ, প্রসাদ আমি খাব না, খেতে চাই না। বালকৃষ্ণ 'কৃপা' মাহাত্ম্য অবগত ছিল, রায় বাহাদুর, জমীদার পুত্র জামাতার বড় বড় চাকরীলাভ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী যাহা জ্ঞাত ছিল, সবিস্তারে কহিয়া সুমতির পাপ-কথা প্রত্যাহারে যথেষ্ট সহায়তা করিল কিন্তু সুমতি দৃঢ়স্বরে তাহাকে জানাইয়া দিল যে হাকিম নড়িবে, হুকুম নড়িবে না। বালকৃষ্ণ ভৃত্য মাত্র, সে তাহার প্রভুস্থানে সংবাদ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

গুরুভাইদের সাক্ষাতে পত্নীর এতাদৃশ দুর্বিনীত আচরণের সংবাদ পাইয়া, সাতকড়ির দেহ মন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তিনমাস সে এখানে বৃথায় হরণ করে নাই, শান্তিপূর্ণ স্থানের

মাহাত্ম্য তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়াছিল, রাগ হইলেও সে তাহা দমন করিয়া রহিল; বৈষ্ণবের পক্ষে ক্রোধ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি আচারণ যে কত হীন তাহা সে ভালরকমই জানিত, তাই এই বিষম ক্রোধও প্রকাশ হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই, মঠের নিত্য নিয়মিত কার্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল ও সেই সঙ্গে ইহাও শপথ করিল, একমাত্র ইষ্টচিন্তা ছাড়া কোন চিন্তাতেই ব্যাকুল হওয়া তাহার মত ভক্তের উচিৎ হইবে না।

কিন্তু কৃপাসিন্ধুর অন্যান্য শিষ্যগণ সাতকড়ির এই ঔদাসীন্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারা সুমতিকে প্রসাদ পাইবার আদেশ জানাইয়া আসিতে সাতকড়িকেই পাঠাইয়া দিলেন। সুমতি তাহার কোলের শিশুটিকে কোলে বসাইয়া দুগ্ধপান করাইতেছিল, সাতকড়ি স্থির করিয়াছিল, অত্যন্ত সংযত, স্থির ও শান্তভাবে তাহার বক্তব্যটি বলিয়া চলিয়া আসিবে। কিন্তু বিধি বাম! সুমতি তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়া ফেলিল। সে হাসির আবার এমনই শ্রী যে সাতকড়ি সব-কথা ভুলিয়া গেল। কেবল দারুণ তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষারঞ্জিত হাস্যটুকু তাহার মনের ভিতর সব উলোটপালট করিতে লাগিল। সুমতি অঞ্চলটি গলায় কুণ্ডলাকারে জড়াইয়া মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, বলিল—এ অধমকে একটু কৃপা করবেন। বড় পাতকী আমি!

সাতকড়ির বৈষ্ণব-ধর্ম বুঝি ভাসিয়া যায়! উঃ এত অবহেলা!

তাহার চোখ দু'টা দেখিয়াই ভিতরের অবস্থাটা সুমতির বুঝিতে বাকী রহিল না। স্বর বদলাইয়া জিজ্ঞাসিল—ভাল ছিলে?

হুম্!

সুমতি বলিল—বস একটু।

সাতকড়ি লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া পাইল গম্ভীরভাবে বলিল—কাজ আছে, বসবার সময় নেই।

সুমতি হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না; অতি কষ্টে গোটাকতক ঢোঁক গিলিয়া, বলিল—একটু দাঁড়াও, আস্‌ছি।—বলিয়া সাতমাসের শিশুটিকে সাতকড়ির পায়ের কাছে, বালু-স্তূপের উপর ফেলিয়া দিয়া বাসাবাড়ীর ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। খোকা এরূপ অনাদরে অভ্যস্ত ছিল না, ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই উল্টাইয়া পড়িয়া বালিতে মুখ গুঁজিয়া গেল।

সাতকড়ি স্পর্শ না করিতেই প্রস্তুত ছিল, যেহেতু তাহার গুরুভাইগণ এ সকল বিষয়েও তাহাকে যথেষ্ট তর্ক করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু পারিল না, গাদা গাদা বালি মুখে ঢুকিতেছে, চাই কি এতক্ষণে পেটেও কিছু ঢুকিয়া গেল সাতকড়ি অত্যন্ত দ্বিধা ভরে ছেলেটাকে তুলিয়া লইল; কোলে তুলিল না, ঝুলাইয়া রাখিল।

সুমতি আসিয়া বলিল—কলকাতা থেকে কিছু মিষ্টি এনেছি, খাবে?

না।

কেন ?

নিষেধ আছে। একে ধর।

একটু রাখ না—ছেলে ত !

আমার ভাল লাগে না ও সব।

আচ্ছা, একটু রাখ, গদাধরকে জল খাবার দিয়ে আসি।

সুমতিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সাতকড়ি ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—এটা...

খোকাও মা'র কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, সুমতি তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গালে গোটা দুই টোকা মারিয়া বলিল এখুনি আসছি।

সাতকড়ি আহা ভাল মানুষ বেচারী ! কি আর করে !

সুমতি হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—কবে ফেরা হবে ?

ফেরা হবে না।

কেন ?

গৌরচন্দ্রের কৃপা !

সুমতি মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, বলিল—চাকরী ?

সাতকড়ি নির্ব্বিকার, কহিল—ত্যাগ করব !

ছেলে পুলে ?

মঠে থাকে থাক্‌বে, নয় আমি জানি নে।

মঠে কি কর্‌বে ?

সেবা কার্য্য।

সুমতি হাসিয়া ফেলিয়া ছেলেটিকে সাতকড়ির কোল হইতে টানিয়া বলিল—সে সব হচ্ছে না।

সাতকড়ি বলিল—হতেই হবে।

আচ্ছা দেখা যাক্‌।

মহেন্দ্র-দাদা এই পথ দিয়াই সমুদ্র তটোদ্দেশে চলিয়াছেন, শিশুপুত্রকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সান্ধ্য মুহূর্ত্তে দম্পতীর এই প্রণয়লীলা দর্শনে, কালবিলম্ব না করিয়া মঠে ফিরিলেন।

সাতকড়ি আসিবামাত্র বড় মহারাজ কহিলেন—ঘন ঘন তোমার ওখানে যাওয়ার আবশ্যকতা নাই !

সাতকড়ির স্বপক্ষে বলিবার অনেক কথাই ছিল কিন্তু একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিবার অবসর পাইল না ; বড় মহারাজ নির্ম্ম আদেশ প্রচারিত করিয়াই স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন।

সাতকড়ি ভাবিতে লাগিল—কি সর্ব্বনাশই সুমতি করিল !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বালকৃষ্ণ ব্যাপারটা সবিস্তারে কহিল, শুনিয়া সুমতি খুব হাসিল, বালকৃষ্ণকে সত্ত-সাজা পাণ জর্দা উপহার দিয়া ফেলিল।

পরদিন একটিবারও সাতকড়ি এ-পথ মাড়াইল না ; তার পরদিনও কাটিয়া গেল, সাতকড়ির দেখা নাই। সুমতি বুঝিল, বালকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছে, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেদিন বালকৃষ্ণ আসিতেই কহিল—বাবুকে একবার ডাকৃতে পার বালকৃষ্ণ ?" বালকৃষ্ণ খুব পারে—বলিয়া চলিয়া গেল, দশমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কি দরকার বল্‌তে বল্লেন, বাবু আস্‌তে পারবেন না।

সুমতি বলিল—কিছু জিনিষপত্তর কিনে দিতে হবে, এই আমি ফর্দ করে রেখেছি, দাও গে !

বালকৃষ্ণ আবার ফিরিয়া আসিল—টাকা ?...বাবুর কাছে কিছুই নাই।...মাহিনার যে টাকা তিনি বরাবর পাঠান, তাহা হইতে এই সকলের দাম দিতে বলিলেন।

সুমতি মনে মনে হাসিল, মনে মনেই বলিল—আ আমার গৌরভক্ত রে ! প্রকাশ্যে কহিল—জিনিষে দরকার নেই বল-গে যাও। না খেয়ে মরবো সেও ভাল, তবু কিছু চাইব না।

বালকৃষ্ণ বেচারার পায়ের দড়ি ছিঁড়িবার উপক্রম করিল। আবার আসিতে হইল। "ফর্দ ?"

নেই।

কিয়ৎকাল বাদানুবাদের পর সুমতি গোপন হাস্যের সহিত ফর্দ ফেলিয়া দিল। সাতকড়ি ফর্দ হাতে লইয়া বড় মহারাজের সমীপস্থ হইয়া কেশ কণ্ডুয়ণ করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র-দাদা পাশে বসিয়া প্রদীপ সাজাইতেছিলেন, কহিলেন—ওকি হে সাতকড়ি দা, বাসার খবর বুঝি ?

সাতকড়ির তালু শুষ্ক হইয়া আসিল ; বড় মহারাজের মুখের পানে সে চাহিতেও পারিতে-ছিল না।

বড় মহারাজ নিজেই জিজ্ঞাসিলেন—কি সাতকড়ি ?

এ-ক-টু বাজার !

যাও।

সাতকড়ির মাথার ঘাম টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল ; চলিয়া যাইবার সময় বড় মহারাজ বলিলেন—ভালর জন্যই বলা, সাতকড়ি। প্রভুর রূপা পেয়ে আবার বঞ্চিত হও, আবার নরক বাস কর, এই ভয়।

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি

সপ্তমবর্ষ

উদ্যান-বিহারিণী

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার।

শুষ্ক তালুতে রস টানিয়া সাতকড়ি কহিল—আজ্ঞে-না !

হ্যাঁ সেইটি সাবধান ! মঠটি আমাদের নতুন হচ্ছে, এখন সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাই করতে হ'বে, সংখ্যা হ্রাস করলে ত চলবে না সাতকড়ি। তোমার স্ত্রীকে দীক্ষা নেবার কথা বলেছ ?

সাতকড়ি অপরাধীর মতই বলিল—সেইদিন একবারের জন্তে দেখা..

মহারাজ সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন বোলো তাঁকে !

বলিবে, বলিয়া সাতকড়ি মঠ ত্যাগ করিল।

রাত্রে বালকৃষ্ণর মারফতে বাজার পাঠাইয়া দিল, নিজে গেল না। পরদিন দিবাভাগে একবার গিয়া দীক্ষার কথাটা বলিয়া আসিবে—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প গড়িয়া রাখিল। বড় মহারাজ, অপ্রকট গুরুর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য, দূরদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ তিনি, তিনি যখন একবার সন্দেহ করিয়াছেন, সাতকড়িকে সাবধান হইতেই হইবে। এতদূর অগ্রসর হইয়া যদি আবার সেই নরকে পড়িতে হয়—ও-হো-হো ! ভাবিতেও যে হৃৎকম্প হয় ! সেই স্ত্রীর তর্জন গর্জন, সেই পুত্র কন্যার হাহাকার, সংসার কালনেমির ঘর্ঘরধ্বনি, সেই নাই-নাই - আর এখানে, আহা দুইগাছি মালা গাঁথিয়া আটবার প্রসাদ পাইয়া—আঃ!

সাতকড়ি কল্য একবার দেখা করিবে ! কিন্তু একটু ভয় হয়। সুমতিটা যেন কি ? একটুখানি কি ভয় ডর আছে ! একেবারে ডাকাবুকো ; আর ভারি ক্যাঁট-কেঁটে ! তাইত ! চোখোচোখী চাওয়াই ত মুস্কিল হইবে ! আচ্ছা একজন গুরুভাইকে সঙ্গে লইলে হয় না ? না, তাহা হইলে হইবে না, সুমতি এক গলা ঘোমটা টানিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর—উপায় ? সাতকড়ি অন্ধকারে কড়িকাঠ দেখিতে দেখিতে মনকে দৃঢ় করিবার পরামর্শ দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু দিনেরবেলা তাহার সাহস টুটিয়া গেল। চোখোচোখী চাহিতে হইবে ! তাইত ! একটা চশমা থাকিলে ভাল হইত ! নীল বা কাল কাঁচের চশমা ! কিন্তু তাহা যখন নাই—তাইত ! সে-দিনটাও মনকে দৃঢ়তা শিক্ষা দিতেই অতিবাহিত হইয়া গেল। আগামী কল্য যাহাতে আর অপব্যয়িত না হয়, সাতকড়ি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে, কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিল।

ঘটিয়া গেল—অন্যরূপ ! কোন কষ্টই আর তাহাকে করিতে হইল না, চশমা, কাঁচ কিছুরই দরকার হইল না। এক ঘণ্টার মধ্যে অঘটন ঘটিয়া গেল।

মঠের আরতি শেষ হইয়াছে। সাতকড়ি খঞ্জনী বাজাইয়া নৃত্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, উত্তরীয়খানি নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছে—সাতকড়ির জ্যেষ্ঠা কন্যা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবা, অজিতের বড় অসুখ করেছে। কি রকম হয়ে গেছে বাবা, শীগ্‌গির করে এস বাবা ?

সাতকড়ি অবিচলিত ভাবে কহিল—কি অসুখ ?

কি জানি বাবা, কি রকম, গাতার মত হয়ে গেছে ! মা কাঁদছে, বল্‌ছে..

মহেন্দ্রমহারাজ নিকটেই ছিলেন, বলিলেন—যাও হে সাতকড়ি !

সাতকড়ি কন্যার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। অজিত লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল, কক্ষে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপ জ্বলিয়া মৃদু আলোক ছড়াইতেছিল, সাতকড়ি ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—কি অসুখ ?

ওগো, কাছে এসে দেখ ! বাছা আমার ..বলিতে বলিতে সুমতি মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাতকড়ি বসিল। সেই সময়েই সমুদ্রের একটা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিল। সাতকড়ি বলিল—আলোটা জেলে ফেল। হ্যাঁ, কি হয়েছে বলে ?

ওগো, কি-জানি কি হ'ল, বাছা আমার বেড়িয়ে এল, এসেই···ওকি উঠ্‌লে যে !

খোকা বুঝি এইখেনে পড়েছিল—আঃ ! জ্বালাতন করেছে।—সাতকড়ি ডিঙ্গি মারিয়া চৌকাঠের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুমতি বলিল—কি হয়েছে ?

হবে আবার কি ? এই কাপড় দেখ ! সাধে আসি না !

ওগো, আজকে ও-সব কথা বল না। বাছা আমার অঘোরে পড়ে আছে, খোকা মুতে ফেলেছে ?

হুম্‌ !

সুমতি অন্ধকারেই আল্‌না হইতে একখানা কাপড় টানিয়া বলিল—ওখানা ছেড়ে ফেলে এইখানা পর। ওখানা কেচে শুকিয়ে কাল মঠে পাঠিয়ে দেব'খন !

কাজে-কাজেই !

সাতকড়ি কাপড় ছাড়িয়া বসিল, সুমতি বলিল—গদাধরকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি, সে আসা পর্য্যন্ত তুমি থাকো।

অগত্যা সাতকড়ি তাহাতে স্বীকৃত হইল।

সুমতি কি বলিতে যাইতেছিল, বালকৃষ্ণ হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—বড় মহারাজ—

আর বলিতে হইল না, সাতকড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

সুমতি লেপ খুলিয়া, অজিতকে বুকে চাপিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল ; অজিতের খাবার ঢাকা ছিল, খুলিয়া দিতেই অজিত ভোজনে বসিয়া বলিল—বড্ড ঘাম হচ্ছিল মা ! আচ্ছা মা, আর ত অসুখ হবে না।

সুমতি সবলে বুকে চাপিয়া বলিল—না বাবা, আর হবে না !

মঠে পৌছাইতেই সাতকড়ি সামনেই দেখিতে পাইল, বড় মহারাজকে।

বড় মহারাজ সাতকড়ির আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন—মহেন্দ্র !

মহেন্দ্র আসিলেন, তিনিও নির্বাক বিস্ময়ে সাতকড়ির দেহের দিকে চাহিলেন।

কালী-দা আসিলেন ও সম-দশা প্রাপ্ত হইলেন।

মিহির দা' দশা পাইতে পাইতে বলিলেন—বাসায় যাও, সাতকড়ি। ও কাপড় মঠের কাপড় নয়!

সাতকড়ির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ যে নীলাম্বরে ভুরে!

বলিতে গেল—খোকার অসুখ ··

বড় মহারাজ বলিলেন—মিথ্যা কথা! তোমার ছেলে রান্নাঘরে বসিয়া লুচি খাইতেছে।

সাতকড়ি আছড়াইয়া কি কহিতে গেল, বড় মহারাজ তৎপূর্বেই কহিলেন—দেখ গে!

মাথায় আগুন, পায়ে আগুন লইয়া সাতকড়ি বাসায় আসিয়া যাহা দেখিল, তাহা আর কহতব্য নহে! রাক্ষসী সুমতির অধরে কি-ও? হাস্য না? ত্যাগ! ত্যাগ! ত্যাগই ইহার একমাত্র শান্তি!

সাতকড়ি ত্যাগের পরামর্শই করিতে ছুটিতেছিল, বাসার দ্বারে মহেন্দ্র ইত্যাদি দাদারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন আর নয় সাতকড়ি।

দাদা!

বাড়ী যাও!

আমার কোন দোষ নেই।

কে বল্‌ছে আছে—যাও!

রূপা······

ওঁর রূপা চাও।

মহেন্দ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন, পিছন হইতে সুমতি হাত ধরিল।

বলিল—এসো, চাইতে হ'বে না, গাদা-গাদা রূপা দেব, এস বলিয়া এক রকম হিঁচড়াইয়া ঘরে পুরিয়া দ্বার দিল।

লুচী খাওয়াটা যে অপরাধ অজিত তাহা জানিত না, তবে একটু আগে অসুখ হইয়াছিল সেই যা! অজিত তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

আমার গান

(অনুকৃতি কৌতুক)

ওরে আমার গান।
কাহার কণ্ঠে আদরেতে চাস্ পেতে তুই স্থান ?

* * * *

জবর মোচ্ খাড়া করে দাড়ীভরা মুখে
ওস্তাদজী গাহেন যেথা কালোয়াতী সুখে—
কণ্ঠে যাঁহার হাঁড়ীচাচা হয় গো লজ্জা-ম্লান
সুরে তালে নিক্তি ধরা—শুনে হাঁফায় প্রাণ
তাঁর গলাতে সত্যই কি চাস পেতে তুই স্থান ?

কিম্বা যেথায় ক্ষীণকণ্ঠি পিয়ানোর সাথে
লতার মত দুলিয়ে দেহ বসি জ্যোৎস্না রাতে
চিঁ চিঁ করা অনুনাসিক কণ্ঠে ধরেন তান
ইচ্ছা কি তোর সেই গলাতে কর্ত্তে অধিষ্ঠান ?

কিম্বা যেথায় ছোকরা বাবু চশমা-আঁটা চোখে
টেবল হার্ম্মোনিয়াম সাথে গাহেন মন সুখে
গান চলেন এক রাস্তাদে অন্য রাস্তায় সুর
গা'ন আর মাথা নাড়েন "আহা কি মধুর !"
সিগারেটের গন্ধে ভরা ধরা-গলায় স্থান
পাবার তরে ব্যাকুল কি তুই হতভাগা গান !

বখা ছেলের দল জুটে পোড়ো বাড়ী খুঁজে
আড্ডা জমান কোন মতে মাথা রাখি গুঁজে—
'পনর টাকার হার্ম্মোনিয়ম' বাঁয়া-তবলা যোগে—
তাড়ীখানায় মানায় হার, প্রতিবাসীরা ভোগে
সেই বাবুদের নেশা-ধরা গলার মাঝে স্থান
পাবার ভরসা করিস কি তুই লক্ষীছাড়া গান।

বুড়ো বয়সে সজ্জা করে সাজিয়া নব যুবতী
নৃত্য করেন রঙ্গমঞ্চে জাগায়ে মনে কুমতি—
সেই সিদ্ধেশ্বরীর বোদা গলায় কর্ত্তে অধিষ্ঠান
ছেলে বখাতে দেশ মজাতে চাস্ কিরে তুই গান !

পথ ভিখারী গাহে যথা ভিক্ষা তরে পথে
কেউ বল্লেন 'মাপ করো বাপ'—কেউ ঠাট্টা করেন তাতে
পেটের জ্বালায় কাঁদছে যে তার করুণ কণ্ঠে স্থান
পাবার স্পর্দ্ধা করিস কি তুই দুষ্ট, আমার গান ?

খোকা বাবু হাসি মুখে খেলার ছলে গা'ন
"বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদী এল বাণ"
সেই কচি গলার পবিত্রতার রাখতে পারিস মান
সে অহঙ্কার আছে কি তোর স্বার্থ-ভরা গান ?

নবীনা বধূ নূতন বরের আবদারেরই মান্
রাখতে যেথায় নীরব রাতে চাপা গলায় গা'ন
ফুটে উঠে যে সুরেতে নবীন প্রেমের টান্
সেই কিশোরীর সুধাকণ্ঠে পাবি কি তুই স্থান ?
লজ্জা আবরণ ভেদি চাস্ যেতে কি গান ?

জষ্টি মাসের ষষ্ঠী বাটায় শ্বশুর বাড়ী গিয়ে
প্রিয়ার অভিমান ভাঙাতে পায়ে হাত দিয়ে
"দেহিপদ বল্লভং" বলে ধরেন গান—
সেই লজ্জাহীনের কণ্ঠ সজ্জা করে ভাঙিস্ মান্
কি নির্লজ্জ কি বেহায়া তুইরে প্রেমের গান !

কিম্বা যেথায় ভক্ত বসে নির্জ্জন বনমাঝে
ভক্তিভরা কণ্ঠে ডাকেন শ্যামসুন্দর সাজে
কামনাহীন বাসনাহীন সেই হৃদয়ের গান
সেই ভক্তিভেজা কণ্ঠে পেতে দেবদুর্ল্লভ স্থান
বড় উচ্চ আশা রে তোর হতভাগা গান !

* * * *

রবী কবির গন্ধ নিয়ে ছন্দের এ অপমান
না বুঝি তুই কর্ল্লি কবি ভাগ্যেতে তোর বর্ত্তমান।

হরেক রকম খোঁপা।

পুরাকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কেশ বিন্যাসের গৌরব সমভাবেই অক্ষুন্ন আছে—কাল ও রুচির পরিবর্ত্তন অনুসারে কবরী কেবল বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, এমন কি শিক্ষিত বাংলা সমাজেও এখন পর্য্যন্ত কবরীর প্রতাপ অক্ষুন্নই আছে। তাই কয়েকপ্রকার কবরীবন্ধনের চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল। আশা করি, কবরীবিলাসিনীগণ ইহাতে কিঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিবেন। কয়েকটী বিদেশী খোঁপার চিত্রও প্রদত্ত হইল।

বেনেবউ খোঁপা — পা[illegible] আরম্ভ — এলো খোঁপা

মেমে[illegible] খোঁপা — [illegible] খোঁপা

হরেক রকম খোঁপা

চিংড়ের টে…

কিকিঞ্জি খোঁপা

ব্রহ্মদেশের খোঁপা

হাউউইঙ্গার খোঁপা

হরেক রকম খোঁপা

টপনচ্ খোঁপা

পুরাকালের খোঁপা

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট

হাফ চূড়া

হরেক রকম খোঁপা

কৃষ্ণচূড়া

বাবয়ানা

মালতী-মালা

এলবার্ট ফ্যাসান

ইন্টার-মিডিয়েট

ফরগেট-মি-নট

লেডী টিচার খোপা
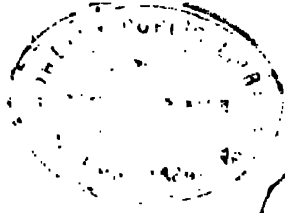
মর্ম্মস্মৃতি

দিনগুলো সব উড়ো পাখী—
কেমন করে এসেছিল
জোড়া দেয়া আমার বুকের খাঁচাতে;
পালকে তার আলোক মাখি'
পুচ্ছ তুলে নেচেছিল—
বুকের জমা রক্তটুকু নাচাতে।

মনের 'আদার' দিয়েছি তারে
যত্ন করে আপন হাতে;
ভুবন-ভোলা কণ্ঠস্বরে ভেসেছি,
মনে পড়ে দিবস রাতে
এই কথাটি বারে বারে—
মিথ্যারে কি শুধুই ভাল বেসেছি ?

দিনগুলো সব ফাগুন দিনে
বকুল হয়ে ফুটেছিল
শুকনো শাখার সকল পাতা ভরিয়া;
কুড়িয়ে নেবার মানুষ চিনে
আপন মনে হেসেছিল
আঁচলে মোর আপনি প'ল ঝরিয়া!

উত্তোর হাওয়ায় সজাগ হয়ে
পরাণ বঁধুর পথের পানে
রইল চেয়ে আঁখিটি আমার দুরন্ত,
হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতির ভয়ে
রেখেছিলাম আগ্‌লে প্রাণে
আজ মনে হয় দিনগুলো সব দুরন্ত!

দিনগুলো যে প্রাণ সাগরে
উত্তাল মাতাল পাহাড় প্রমাণ
ঢেউ তুলিয়া কল্লোলিয়া ছুটেছে
তপ্ত বালির সেই সায়রে
বিলিয়ে দিয়ে সমস্ত প্রাণ
আহ্লাদে সে তটের বুকে লুটেছে।

তারের তরীর বাঁধন কাটি'
ভাসিয়ে দেছে নীলদরিয়ায়
আজকে তারা তেমনি বাঁধা কূলেতে,
মরীচিকার আবছায়াটি
আঁখির আগে,—বুক ফেটে যায়
সাগর শুকায় আমারি কোন ভুলেতে ?

দিনগুলো যে জ্যোৎস্না রাতের
সমস্তটুক আবেশ নিয়ে
ঘুমিয়ে যেত আমার ভরা বুকেতে,
কণ্ঠ-মালা প্রিয়ার হাতে
আকুল অধর সুধা পিয়ে
রঙীন প্রাতে উঠত জেগে সুখেতে;

সারাদিনের সকল স্মৃতি
ঘনিয়ে উঠে সন্ধ্যাবেলা
বিছিয়ে দিত মিলন মধুর মায়াটি;
গভীর প্রেমের এই কি রীতি·
দুঃখ সুখের মধুর স্মৃতি
দিয়ে গেছে কান্নার সাথে ছায়াটি!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আত্মীয় মন

মৃণাল উনুনের উপর দেহখানা একটু বাঁকাইয়া কাটলেট ভাজিয়া উঠাইতেছিল। রান্নাঘরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিতেছে। একটু দূরে ঠাকুর দাঁড়াইয়া অতি নিবিষ্টচিত্তে কাটলেট ভাজা দেখিতেছে। পার্শ্বে মালতী ঝি দাঁড়াইয়া একখানি হাত-পাখা দিয়া মৃণালকে বাতাস করিতেছে।

মৃণাল শেষ কাটলেটগুলি প্যানে ছাড়িয়া দিয়া উন্টাইতে উন্টাইতে ঠাকুরের পানে দৃষ্টি উঠাইয়া কহিল—ঠাকুর এই ভাবে কাটলেট ভাজতে হয়। একদিন দেখিয়ে দিলেই তো এ শিখে নেওয়া যায়। আর তোমায় কতদিন যে দেখিয়ে দিলুম—তবু কোনদিন হয় একেবারে কাঁচা, নয়তো পুড়িয়ে আঙ্গার।

ঠাকুরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কর্ত্রী ঠাকুরাণীর এই কথায় কাঁপিয়া উঠিল। মৃণাল ঠাকুর বলিয়া ডাকিতে সে একবার মাত্র নিমেষের জন্য চোখ দুটি উপর পানে তুলিয়াছিল। তারপর আবার দৃষ্টি নীচু করিয়া উনুনের পানে চাহিল। আর চোখ তুলিতে পারিল না। মৃণাল ভাজা কাটলেটগুলি সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে মালতীর পানে চাহিয়া হাসি মুখে কহিল—মালতী এর মধ্যেই তুই আবার বাতাস করতে সুরু করে দিয়েছিস! তা বেশ বুদ্ধির কাজ করেছিস - যে গরম।

মালতী হাসিতে হাসিতে কহিল—তা দিদিমণি তুমি যে ঘেমে গিয়েছ। আর মুখখানা যা লাল হয়েছে—একেবারে জবাফুল! তবে দিদিমণি তুমি যেদিন রান্না ঘরে আস সেদিন সব জিনিসই খেতে যেন একেবারে মধুর আস্বাদ হয়। যা-ই বল ও ঠাকুর হাজারই মন দিয়ে রান্না করুক তোমার মতটি কিছুতেই হবার নয়।

মৃণাল কাটলেটগুলি ঢাকা দিয়া রাখিয়া মালতীর মুখ পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। আগুনের আঁচে আর গরমে সে মুখ খানা সত্যই বড় লাল হইয়াছে। কপোলের উপর মুক্তার মত ছোট ছোট ঘামের বিন্দুগুলি জমিয়াছে। সুন্দর মুখের উপর সুন্দর ভ্রূ জোড়া, তার উপরেই কালো কেশের রাশি। টানা চোখের হাসি-ভরা চাহনী—সম্মুখে উনুনের মৃদু আঁচ, উপরে বিজলী বাতীর আলো—মৃণালকে আরো সুন্দর দেখাইতেছিল।

মৃণাল হাসিয়া বলিল—তাই বুঝি তোর ইচ্ছে রোজ আমি এসে রান্না করে দি! ভারী মজা—

মালতী কহিল—না দিদিমণি, রোজ আর কেন আসবে - তবে একবার করে তুমি এলেই দেখবে সব অমৃতের মত লাগবে খেতে। অন্নপূর্ণার আগমনে সব ভাল হয়ে যায়।

মৃণাল কহিল—আচ্ছা যা-যা, অন্নপূর্ণা আর হতে হবে না আমার। আমার স্নানের ঘরে জল আছে তো—আমি একবার গা ধুয়ে ফেলবো।

সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি দিদিমণি। তুমি এ অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এস এখন!

মৃণাল মালতীর সঙ্গে বাহির হইতে ঠাকুরকে কহিল—ঠাকুর, বাবুকে যখন দেবে গরম করে দিও।

মৃণাল ও মালতী বাহিরে গেল। ঠাকুর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

২

মৃণাল প্রকাণ্ড একখানি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। আয়না খানিতে তাঁহার সমস্ত দেহ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাহার সুগঠিত নমনীয় দেহের গোলাপী আভা বিদ্যুতের আলোকে আরও রমণীয় দেখাইতেছিল। কালো ঢেউ-খেলান চুলের রাশি প্রায় হাঁটুর নীচে এলাইয়া পড়িয়াছে। হাতের চিরুণী খানা টেবিলের উপর রাখিয়া মৃণাল চেয়ারে বসিল। ছড়ান চুলের রাশি মেজের কার্পেট ছুঁইয়া রহিল।

মালতী দোরের বাহির হইতে কহিল—দিদিমণি আমি চুল বেঁধে দি এসো।

মৃণাল শুনিয়াও মালতীর কথা শুনিল না। আপন মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দোর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মালতী আবার কহিল—আসবো দিদিমণি।

রুক্ষস্বরে মৃণাল কহিল—না-না-না, আসতে হবে না। এক মুহূর্ত্ত শান্তিতে থাকবার জো নেই এদের জন্যে। কোন দরকার নেই আমার, তবু—আসবো নাকি—দরকার আছে নাকি! ওরে মালতী পোড়ারমুখী, বলছি আমার দরকার নেই—আমায় বিরক্ত করিস নি। আমার মন ভাল নেই—

মালতী এতক্ষণ বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল, এইবার মন ভাল নাই শুনিয়া একেবারে মৃণালের গায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কেন দিদিমণি, বল আমায় মন ভাল নেই কেন?

মৃণাল এইবার একটু হাসিয়া কহিল—ভাল মুস্কিল—মন ভাল নেই তাও আমার ওর জন্য মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। তখনি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মন ভাল নেই—ব্যস নেই। আরে পাগলী মন কি আবার কখনো কৈফিয়ৎ দিয়ে ভাল আর মন্দ হয় নাকি! মনের খেয়াল হোল বিগড়ে গেল।

না দিদিমণি সত্যি বল—তোমার মন এখন কি চাইছে আমায় বল—আমি এনে দিচ্ছি। দেখবে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে। মন যা চায় সেইটি পেলেই আর মন খারাপ হতে পারে না। বল না দিদিমণি!

মৃণাল উঠিয়া চুলগুলি ব্রাস দিয়া আঁচড়াইতে আচড়াইতে মালতীর পানে চাহিয়া কহিল—বাবু কোথা মালতী!

মালতী হাসিয়া কহিল—ওঃ—এই কথা সে আমি এখুনি এনে দিচ্ছি। দু'দণ্ড না দেখলেই দিদিমণি একেবারে পাগল হয়ে যান। ও আমি আগেই জানতুম দিদিমণির মন খারাপের কারণ কি! আচ্ছা দিদিমণি— দাও—তোমার চুলটা বেঁধে দিয়েই আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

না বলছি তবু—আমার চুল আজ আমি নিজে বাঁধবো। আর কারো বাঁধা আমার পছন্দ হবে না।

বাবু বৈঠকখানায় কার সঙ্গে গল্প কচ্ছেন - আসতে একটু দেরী হতে পারে।

মৃণাল আবার রুক্ষস্বরে কহিল—দেরী হতে পারে সে আমি জানি—দোরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি—যেই লোক চলে যাবে অমনি বাবুকে বলবি ভেতরে আসতে। এটুকু কাজও যদি তোদের দিয়ে না হয়—তবে আর কি!

মালতী আর কথা না কহিয়া বাহিরে গেল।

৩

মৃণালের চুল বাঁধা আর হয় না। কতবার কত রকম করিয়া বেণী গাঁথিয়া সে আবার তাহা খুলিয়া ফেলিতেছে। আবার বাঁধিতেছে আবার খুলিতেছে—কিছুতেই তাহার মন মত হইতেছে না। এতক্ষণ চলিয়া গেল—এখনও সে আসিতেছে না কেন?

মৃণাল এলানো এক গোছা চুল হাতে ধরিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া আয়নার পানে চাহিয়া আছে—কি ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার মুখখানি হাসিতে একেবারে ভরিয়া উঠিল। সে হাসির আলোতে বিদ্যুতের আলোর ঝলকও ম্লান হইয়া গেল।

একবার তেমনি মধুর হাসি হাসিয়াই মৃণাল মুখখানি আবার আগেকার মতই করিবার চেষ্টা করিল। পেছন হইতে কে ধীরে ধীরে মৃণালের পাশে আসিয়া তাহার চুল গোছা হাতে তুলিয়া লইয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—মুখ ভরা হাসি দেখবো—তেমন ভাগ্যি আর কি করেছি! হাসিও দেখছি আমায় দেখলে লুকিয়ে যায়!

মৃণাল মুখ তুলিয়া কহিল—হাসি লুকোয়—না হাসিকে দেখবার ভয়ে লুকিয়ে থাক। আজ আসবার কথা কত সকালে—তা নয় এই এক সন্ধ্যা আমি একা-একা বসেই আছি—আর বসেই আছি—বাবুর আসবার নামটিও নেই। তারপর শুনলুম যদিও বা বাড়ী এসেছেন—তা-ও আবার নীচে কার সঙ্গে যেন গল্পে জমে গেছেন। আমরা গল্পের মানুষই বা কি—আর আমাদের সঙ্গে গল্পই বা কি!

না না—লক্ষ্মী মিনু আমার—রাগ কোরো না। আমার কি আর ইচ্ছা এক দণ্ড তোমায় ছেড়ে থাকি। তবে কিনা দেখ বাইরের পাঁচ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় আমাদের। এই দেখ বিকেলে বের হয়ে ক্লাবে গেছি - আরো কত জায়গায় গেছি। তারপর বাড়ী এসে উপরে আসবো—

দেখি এক ভদ্রলোক খুব একটা জরুরী কাজ নিয়ে এসেছেন মফঃস্বল কাচারী থেকে—আজ রাত্রের গাড়ীতেই তিনি ফিরে যাবেন। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা মিটিয়েই অমনি চলে এসেছি। তুমি রাগ করেছ লক্ষীটি আমার উপর।

মৃণাল স্বামীর বাহুর উপর মাথাটি রাখিল। তাহার এলো চুলগুলি স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। কমল পত্নীর চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে কহিল—কি সুন্দর চুল তোমার মিনু আমি বেঁধে দি—বল আজ এলো খোঁপা হবে, না বেণী গেঁথে হবে!

কমল ও মৃণাল দু'জনাই কৌচে বসিয়াছিল, মৃণাল পাশ ফিরিয়া স্বামীর দিকে চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া বলিল—তুমি যা ভালবাস। তোমার ইচ্ছামত বাঁধবো বলেই এতক্ষণ চুল বাঁধিনি।

তবে এলো খোঁপা।

বেশ তুমি বেঁধে দাও।

না গো—আমি বাঁধলে সব চুল নষ্ট করে ফেলবো, তুমি বাঁধ আমি দেখি।

মৃণাল চুল বাঁধিতে বাঁধিতে এক একবার স্বামীর পানে তাহার প্রেমভরা চোখ দুটি তুলিয়া চাহিতেছিল। সে চোখে কত হাসি—কত তৃপ্তি—কত সুখ—কত মধু।

কমল ও মৃণাল স্বামী স্ত্রী। কমলের বয়স বছর ত্রিশ, মৃণালের উনিশ কুড়ি। দু'জনেরই চেহারা বেশ সুন্দর। লক্ষ্মী সরস্বতী দু'জনাই বরাবর ইহাদের স্নেহ চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। জন্মাবধি কখনো ইহারা অভাব অভিযোগের জ্বালা অনুভব করে নাই। স্বামী স্ত্রী দু'জনায় খুব ভাব, সংসারে কোন অভাব নাই—যখন যেমন খুসী তেমন ভাবেই চলিতে পারা যায়, এমন সুখের জীবন আর কি হইতে পারে!

কমল জমিদারের ছেলে। দেশে তাহার বেশ ভাল বার্ষিক আয়ের জমিদারী। কিন্তু দেশে তাহারা বড় থাকে না—দেশের বাড়ী ঘর, জমিদারীর ভার নায়েব গোমস্তাদের উপর অর্পণ করিয়া তাহারা এখন কলিকাতাবাসীই হইয়া পড়িয়াছে।

কমলের বাবা মা কেউ নাই। তাহার বাবা কখনো নিজ বাড়ী ঘর ও জমিদারী ছাড়িয়া দীর্ঘদিন কোথাও বাস করিয়া আনন্দ পাইতেন না—অশান্তিই বোধ হইত। কলিকাতায়, কাশীতে এবং অনেক বড় বড় সহরেই তাঁহার বাড়ী ছিল বটে—কিন্তু বেড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি কখনো কখনো দিনকত যাইয়া থাকিতেন মাত্র। এক মাত্র পুত্র কমল গ্রাম্য স্কুল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইতে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় পাঠান ছেলে কলিকাতায় পড়িতে আসিলে কমলের মা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—কমল কলকাতায়

পড়তে গেল। চলনা আমরাও কলকাতায় যাই। দু'বেলা গঙ্গাস্নান করতে পারবো—তা ছাড়া কমলকেও চোখে দেখতে পারবো।

কমলের বাবা হাসিয়া বলিয়াছিলেন চিরকালই কি আর ছেলেকে কেউ চোখে চোখে রাখতে পারে। ছেলে পিলে যত বড় হয় ততই তারা চোখের বাইরে যাবেই। তা বলে শেষ বয়সে দেশ ছেড়ে কলকাতাবাসী হতে পারবো না।

এমনি ছিল বুড়ো জমিদারের দেশের উপর মায়া। গ্রামের বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা এগুলি সব কমলের বাবার অর্থ সাহায্যে সুচারুরূপে চলিত। প্রজাদের সুখ দুঃখ তিনি নিজে দেখিতেন। তাহাদের জলাভাব অন্নাভাব যথাসাধ্য মিটাইবার চেষ্টা করিতেন।

কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া—ক্রমে সহরের নানা সমাজে ও বিলাসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার উপর কমলের খুব টান পড়িয়া গেল। অবশেষে কমলের মনে হইল সুখ আরাম বিলাসই যদি জীবনের কাম্য হয় তবে কলিকাতাই তাহার যোগ্য স্থান। আনন্দ উল্লাসের এত অজস্র উপাদান আর কোথায় আছে জীবন উপভোগ করিতে হইলে কলিকাতায়ই থাকিতে হইবে।

কমলের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই তাহার বাবা ও মা মারা গেলেন। কমলের কলিকাতাবাস যখন স্থিরই হইল তখন সে তাহার বাঙ্গালী পাড়ার বাড়ী বেচিয়া ফেলিয়া ইংরেজী পাড়ায় সুবৃহৎ এক বাড়ী করিল। দেশের সঙ্গে আগে তাহার সামান্য যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাহাও ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল। এখন কমলের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে শুধু যথা সময়ে জমিদারীর টাকা আদায় করিয়া আনাতে। দেশে যখন তাহার বাবা কত ধূমধাম, উৎসব বিলাস, দান ধ্যান করিয়া রাজার হালে থাকিতেন তখন ঐ জমিদারীর আয় হইতে সব খরচ কুলাইয়াও বৎসরে বৎসরে বহু টাকা জমার তহবিলে যাইত। কমলের সহর জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে দেশের সে সমস্ত উৎসব আনন্দ দান ধ্যান সব তো বন্ধ হইয়াই গিয়াছে তবু কিন্তু জমার তহবিলে একটি পয়সাও জমে না; বরঞ্চ পূর্ব সঞ্চিত যাহা ছিল এখন তাহাতেও হাত পড়িয়াছে।

এক খানার জায়গায় কমলের দু'তিন খানা মোটরগাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীতে প্রায়ই পার্টি হয়—কখনো কখনো বাগানে বড় বড় সম্মানী বন্ধুদের লইয়াও পার্টি দেওয়া হয়। পার্টিতে নাচগান হয়, সাহেবী হোটেলের খানা চলে, সভ্যতার স্বাস্থ্য-পান হয়। পঁচিশ ত্রিশজন বন্ধু বান্ধবের এই একটি সান্ধ্য সম্মিলনে যা খরচ হয় সে খরচে দুএক হাজার পল্লীবাসীর তৃপ্তি ভোজন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

কমলের পত্নী মৃণাল স্বামীর মুখে মাঝে মাঝে মদের গন্ধ পাইয়া বলিত দেখ গো তুমি যদি আবার ঐ বিশ্রী জিনিসটা খাবে তবে তোমার সঙ্গে আমার বেজায় আড়ি চলবে। কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রেমময়ী পত্নীর কটাক্ষের কাছে কমল একেবারে জুজু বুড়ীটি হইয়া যাইত। কমল বলিত—দেখ মিনু, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব খায় তাই আমাকেও একটু খেতে হয় আর আজকালকার বড় লোকের পার্টিতে ও একটু চলেও। আমি বেশী কিছু খাই না। ওতে তুমি রেগো না।

মৃণাল রাগিয়া বলিত—বেশী তুমি খাও কি-না, সে তো আর আমি দেখতে যাই না। আরো কত কি সেখানে কর তার ঠিক কি?

পত্নীর অভিমান দূর করিবার জন্য কমল তাহার হাত ধরিয়া বলিত—তুমি বিশ্বাস কর মিনু—আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি ওসব আর কোনো মেয়েমানুষের দিকে আমি কখনো দৃষ্টি দি না। কখ্খনো না।

এমনি মান অভিমানের পালা তাহাদের মাঝে মাঝে চলিত। অবশেষে মৃণাল তাহার স্বামীর এক-প্রাণতায় বিশ্বাস করিত। স্বামীর সব রকম সুখ আয়েসের দিকে মৃণালের সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। স্বামীর ইচ্ছানুসারে সে লেখাপড়া গান বাজনায় বিশেষ দক্ষ হইয়াছিল। নৃত্য গীতে, সেবায় সে স্বামীর মনোরঞ্জন করিত। হাসিতে গল্পে প্রেমে স্বামীকে ডুবাইয়া রাখিত। কমলও প্রাণ দিয়া পত্নীকে ভালবাসিত। এমনিভাবে পরম সুখে তাহাদের জীবন চলিয়া যাইতেছিল।

৩

সেদিন কমল ও মৃণাল দুইজন পার্ক ষ্ট্রীটের একটা জুয়েলারী দোকানে গহনা-পত্র দেখিতেছে। তাহাদের মোটরখানি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। চুড়ী, ব্রেস্‌লেট, নেকলেস আংটী অনেক জিনিস দেখিতে দেখিতে মৃণালের একটি আংটী বড় পছন্দ হইল। আংটীটি কমলের হাতে বেশ মানাইবে। মৃণাল স্বামীর হাতে আংটীটি পরাইয়া দেখিল তাহার চোখে বড় সুন্দর লাগিল। সে বলিল—এটি তোমায় কিনতে হবে।

কমলেরও জিনিসটি খুব পছন্দ হইয়াছিল, তবু বলিল - কি দরকার—হীরে বসান দেখছি, অসম্ভব দাম হেঁকে বসবে। পুরুষ মানুষের এ সবের কোন দরকার নেই।

মৃণাল হাসিয়া কহিল—না দরকার আছে শুধু পার্টিতে রাশি রাশি টাকা খরচ করবার! এ আমি তোমায় কিনে দেবই।

আংটি পছন্দ হইয়া গেল। তারপর আরো নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে একটি নেকলেস দু'জনারই খুব পছন্দ হইল। কিন্তু নেকলেসটির দাম শুনিয়া দু'জনার মুখই একটু মলিন হইল। জুয়েলার ইহাদের নিজের একটি বড় খরিদ্দার বলিয়াই জানিত। অনেক ভূমিকা করিয়া সে বলিল—এমন সুন্দর নেকলেস আর কোথাও পাওয়া যাবে না- কিন্তু আপনারা আমার পুরোণো খদ্দের—ত্রিশ হাজার টাকা হলে ছাড়তে পারি।

মৃণাল হাতের নেকলেসটি সো-কেসের উপর রাখিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—নাগো থাক—এত টাকার নেকলেসে কাজ নেই আমার। যা গয়না আছে তাই পরা হয় না।

কমল কহিল—পছন্দ হয়তো নাও না। দামে কি গেছে?

না-না। মৃণাল জুয়েলারকে কহিল—কি হয়েছে আংটির দাম! এ আমরা আবার এসে দেখবো। এই বলিয়া আংটির দাম মিটাইয়া স্বামীর হাতে আংটি পরাইয়া হাসিমুখে স্বামীর হাত ধরিয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিল।

৩

মোটরে মৃণালকে তাহার এক বাল্যবন্ধুর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া কমল অন্যত্র গেল। কথা রহিল কমল আবার মোটর পাঠাইবে, সেই মোটরে মৃণাল বাড়ী ফিরিবে। কমলের বাড়ী ফিরিতে কিছু রাত্রি হইবে।

মৃণালের বন্ধুটি উকীলের স্ত্রী। মৃণালের স্বামীর গ্রামেই ইহার বাড়ী। বিবাহের পর হইতেই মৃণাল ও সুনীলার খুব ভাব হয়। কলিকাতায় সুনীলা আসিবার পর হইতে মৃণাল অনেক সময় ইহাদের বাড়ী আসে, সুনীলাও মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ী যায়।

সেদিন অনেকক্ষণ দু'সখীতে কথাবার্তা কহিবার পর সুনীলা মীরা মীরা বলিয়া ডাকিতে একটি মেয়ে তাহাদের কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। ঘোমটায় মেয়েটির মুখ আধ-ঢাকা, হাতে দু'গাছা শাঁখা—পরণের কাপড়খানি আধা ময়লা। সুনীলা মেয়েটির ঘোমটা খুলিতে বলিলে মেয়েটি ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। সুনীলা মৃণালকে কহিল—একে চিনতে পার!

মৃণাল একটু অবাক হইয়া কহিল—না চিনতে তো পাচ্ছি না। কে বল না।

সুনীলা কহিল—না চেনবারই কথা, দেশগাঁয়ের সঙ্গে তো আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের গাঁয়েরই রাধাচরণ দাসের বৌ মীরা এ। ছেলে পিলে কিছু হয়নি এখনো। স্বামীর ঘর থেকে একদিন পাঁচ ছটা বদমাস একে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এর স্বামী বদমাসদের বাধা দিতে গিয়ে তাদের লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পাড়া-পড়শীরা গোলমালে ডাকাত পড়েছে ভেবে যে যার ঘরে খিল মেরে চুপ করে থাকে, এমন অবস্থায় বদমাসেরা একে ধরে নিয়ে যায়। দিন তিন চার পরে সতীত্ব-হারা অবস্থায় এ ঘরে ফিরে আসে। রাধাচরণের ইচ্ছা ছিল মীরাকে সে ঘরে নেয় কিন্তু গ্রামের সকলের আর সমাজের তাড়ায় সে তা পারে নি। অসতীকে ঘরে রাখলে সমাজ তাকে একঘরে করবে। মরে গেলে পোড়াবে না—এমনি কত কি সব বলেছে। তাই মীরা আজ আশ্রয়-হারা অবস্থায় আমার কাছে এসেছে। আমি মনে কচ্ছিলুম আজই ওকে নিয়ে একবার তোমার ওখানে যাব, তা এসেছ—ভালই হয়েছে। এখন কি উপায় করি বলতো।—মীরা ইনিই তোমাদের জমিদার-গিন্নী—

মীরা চোখ তুলিয়া মৃণালের চোখের পানে চাহিল। মৃণাল দেখিল কি সুন্দর কচি ঢল ঢল মুখখানা, টানা চোখ দুটি করুণ সজল—কত বিষাদ বেদনা লাঞ্ছনার ভাব সে চোখে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মৃণাল মীরার হাত দু'খানি ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল। মীরা সঙ্কুচিতভাবে পাশে বসিল। মৃণাল সুনীলাকে কহিল—সুনীলা একে আমি আজ আমার কাছে নিয়ে যাব—তারপর যা করাতে হয় সে দেখা যাবে।

দু' বন্ধুতে আরও কিছুকাল আলাপ করিয়া মৃণাল যাইবার জন্য উঠিল। বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়াছিল। মৃণাল মীরার হাত ধরিয়া মোটরে উঠিয়া তাহাকে পাশে বসাইল। মীরা কিছুতেই তাহার পাশে বসিল না—সে নীচে বসিবে। হাসিয়া মৃণাল সুনীলাকে কহিল—দেখ ভাই মীরার কাণ্ডখানা।

সুনীলা কহিল—ছি—মীরা ওর কথা শুনতে হয়।

মীরা সঙ্কুচিতভাবে পাশে বসিল। সুনীলা ভাবিল—এইবার মীরার একটা গতি হইবে। দেশের অত্যাচার উপদ্রবও কিছু কমিতে পারে। মীরা ও মৃণাল সুনীলার পানে চাহিল—মোটর ছাড়িয়া দিল।

বাড়ী যাইয়া মৃণাল ভাবিল মীরাকে সে নিজের কাছেই রাখিবে। আর এই যে দেশের মেয়েদের উপর যা-তা অত্যাচার হয় স্বামীকে বলিয়া ইহারও একটা প্রতিবিধান সে করিবে। অন্ততঃ তাহাদের জমিদারীর মধ্যে যাহাতে নারীর উপর এমন অত্যাচার না হয় ইচ্ছা করিলে সেটুকু তো তাহারা করিতে পারে। তা নয়, এ একেবারে তাহাদেরই জমিদারীর মধ্যে নিজের গ্রামের মেয়েদের উপর এই অত্যাচার—মৃণালের শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল, মীরার উপর সহানুভূতিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছিল।

বাড়ী যাইতে মালতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদিমণি একটু চা খাবে তো?

দিদিমণির সঙ্গে আরও একজন মেয়ে দেখিয়া মালতী প্রথমটা একটু চমকিয়া গিয়াছিল এ তো তাহাদের দিদিমণিদের দলের কোন মেয়ের মত দেখাইতেছে না—এ যেন কেমন পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত বোধ হইতেছে।

চা আসিলে মৃণাল মীরাকেও এক সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া চা খাইতে বলিল। মীরা তাহা কিছুতেই খাইবে না। মৃণালের দয়ার অত্যাচারে মীরা হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল।

মালতী আসিলে মৃণাল কহিল—দেখ মালতী, মীরা এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে, এ আমাদের গাঁয়েরই মেয়ে—আমার ছোট বোনটির মত।

মীরা কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল—আপনার কত দয়া, আপনি মা ভগবতীর মত। দয়া করে যদি আমাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেন—

মৃণাল মীরার চিবুকে হাত দিয়া কহিল—দেব বোন দেব, সব করে দেব। তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে। মৃণাল ও মীরা দু'জনে বসিয়া কথা কহিতেছিল। মৃণাল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া দিয়া বসিয়াছিল। মীরা মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া মৃণালের পায়ে হাত বুলাইতেছিল। এমন সময়—মিনি মিনি আমার মিনি—বলিয়া কমল ঘরে ঢুকিল। কমলের পানে মৃণাল ও মীরা দু'জনাই চাহিল। কমল ঘরে ঢুকিয়া অপরিচিতা নারীকে তাহার পানে এমনভাবে চাহিতে দেখিয়া সেও সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, মেয়েটি সুন্দরী।

মীরা একবার চাহিয়াই ছুটিয়া পাশের ঘরে গেল। কমল পত্নীর পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল মেয়েটি কে! মৃণাল মীরার দুঃখের সব কথা বলিয়া বলিল ওর যা হয় ব্যবস্থা করতেই হবে তোমায়, যতদিন কোন ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন মীরা আমার কাছেই থাকবে।

কমল বলিল—হুঁ—মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে! তোমার যা ইচ্ছা কর—দেখি আমি কি করতে পারি।

মৃণাল নিজেও দেখিয়াছে মীরা সুন্দরী—স্বামীর কাছেও সে মীরার সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছে কিন্তু স্বামীর মুখে—মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে এই কথাটি শুনিয়া অবধি তাহার মনটা কেমন অস্বস্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে স্বামীর সঙ্গে দু'চারিটি কথা বলিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিল মালতী ও মীরা কি কথা কহিতেছে।

মৃণাল কহিল—মীরা ওঁর সঙ্গে আমার কথা হোল। যত শীগ্‌গির হয় দেশে গিয়ে আমরা তোমার স্বামী যাতে তোমায় নেয় তার ব্যবস্থা কোরবো। তবে বুঝলে এ কয়দিন তুমি সুনীলাদের ওখানেই থাক গিয়ে, সেই ভাল হবে। কাল যদি আমাদের ওঠবার দেরী হয় তো মালতী তোমায় গাড়ী করে সুনীলাদের ওখানে রেখে আসবে।

মালতী কহিল—কেন দিদিমণি—এই না বললে এ আমাদের সঙ্গেই থাকবে। আহা কি সুন্দর মেয়েটি যেমনি চেহারা তেমনি কথাবার্ত্তা। কি দুঃখেরই কপাল। বেশ এক সঙ্গে থাকা যেত।

মৃণাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল—যা যা—সব তাতে তোর মাতব্বরী করতে হবে না। কাল ভোরে মীরাকে রেখে আসবি। এই বলিয়া মৃণাল বাহিরে গেল।

স্বামীর মন

সে রাত্রে স্বামীর পাশে শুইয়া মৃণাল কহিল—বল তুমি আমায় ভালবাস। না আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী আর কাকেও ভালবাস ?

কমল পত্নীকে আলিঙ্গনে জড়াইয়া কহিল—তোমার চেয়ে আর কাকে ভালবাসবো ? তোমার মত সুন্দরীই বা আর কে ? আর আমার প্রতিজ্ঞা তো তুমিতো জানই !

তবু পুরুষের মন বিশ্বাস হয় না।

স্বামী অভিমানের স্বরে কহিল—তা হলে আমাকেও তোমার বিশ্বাস হয় না ?

মৃণাল স্বামীর গলা জড়াইয়া কহিল—খুব বিশ্বাস হয়—ওগো সেই হার ছড়া আমাকে কাল কিনে দেবে তো ?

বেশ ও হারে তোমায় মানাবেও বেশ। আমি তো আজই দিতে চেয়েছিলুম, বেশী দাম বলে তুমিই তো আপত্তি করলে। কালই দু'জনে দেখে নিয়ে আসবো।

কমল ও মৃণাল ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কমল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মীরা সুনীলাদের ওখানে চলিয়া গিয়াছে। মৃণাল তাহাকে কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল আবার তাহাকে হঠাৎ পাঠাইয়া দিল কেন এ সম্বন্ধে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কমল কোন সদুত্তর পাইল না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

অভাগা

প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম, কয়লা-খাদের কাজ সারিয়া, সে তাহার জীর্ণ কুটীর খানির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত! বাহিরে হয়ত, তখন সন্ধ্যা-রাগ রঞ্জিত আকাশে-বাতাসে আলো-অন্ধকারের বিদায়-অভিনন্দন চলিত,-- দিগ্‌বালিকার চুম্বন-রাঙা পশ্চিম কপোলে মনে হইত, কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে,– অদূরে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর, বর্ষাজলসিক্ত খানা-ডোবার ধারে ধারে, রক্ত-পুষ্পাভরণ পলাশের শ্রেণী, অন্ধকারের আগমন প্রতীক্ষায় মৃদুমন্দ সমীরান্দোলনে হেলিয়া দুলিয়া উঠিত কিন্তু সে আনন্দ-সমারোহের সংবাদ লইবার অবসর সে বুড়ার ছিল না। তাহার এই বিচিত্র জাগ্রত-স্বপ্ন রচনায় টুইলা এক-একদিন এতবেশী বিভোর হইয়া পড়িত যে তাহার রাঁধিয়া খাইবার ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত থাকিত না,—সমস্ত রাত্রি হয়ত চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইত। ঘরে-বাইরে বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিলে, কখন-কখন উঠানের অযত্ন-সঞ্চিত আগাছার জঙ্গল হইতে, সর্প-বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত সরীসৃপের আগমন নিবারণ হেতু, কেরোসিনের ক্ষুদ্র ডিপেটি জালিয়া উন্মুক্ত দুয়ারের চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিত। কোনদিন্ বা ঝড়ের ঝাপ্‌টায় আলোটা অকস্মাৎ নিভিয়া যাইত, আবার কোন-কোন-দিন্ আলো অপেক্ষা অত্যধিক ধূম উদ্গীরণ করিয়া, মরণাপন্ন রোগীর স্তিমিতপ্রায় প্রাণ-শিখার মতই মিট্‌-মিট্ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিত।

এম্‌নি করিয়া এই রাণীগঞ্জের কয়লা-কুঠিতে বৃদ্ধ টুইলা কতদিন ধরিয়া যে তাহার বিচিত্র জীবন যাপন করিতেছে, সে ইতিহাস কেহ জানে না। আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি-না, বা পূর্ব্বে কোনদিন্ ছিল কি-না, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুড়া উত্তর দেয় না,—নীরবে যখন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে, তখন কোটর-প্রবিষ্ট সে দুইটা চোখের তীব্রোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে তাকাইতে ভয় পায়—সে অভিনব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বুকের তলায় বিঁধিতে থাকে।

একটা কিছু রহস্য নিশ্চয়ই এই বুড়ার বুকের তলায় লুকানো আছে, তা না হইলে সে এরূপ করিবে কেন? সেটা যে কি বস্তু, তাহাই জানিবার জন্য আমার মনটা বড় বেশী উদ্বিগ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত সুযোগ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

একদা বর্ষা সন্ধ্যায় মেঘে মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। গুরু গুরু তালে, গগণে গভীর মৃদঙ্‌ বাজিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কান্তা-সাকীর অশ্রান্ত শিঞ্জিনী রবের মতই ঝম্ ঝম্ শব্দে বাদল নামিল। নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব আমি—কয়লাকুঠিতে চাকরী করিতে আসিয়াছি,— এই সময়টায় একাকী জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া বহির্জ্জের এই প্রলয়োৎসব নিরীক্ষণ করা যে

কত বড় দুর্ভোগ, তাহা আমি বেশ জানি। বৃদ্ধ টুইলার কথা মনে হইল। আমার জানালার সম্মুখে, অদূরে ওই কয়লা বিছানো কালো রাস্তাটার ধারে তাহার জীর্ণ কুটীর খানি এতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল,—ঘন বর্ষণের ভিতর সমস্তই ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে,—এখন আর ততদূর নজর চলিতেছে না। ভাবিলাম, বাদলের ধারা একটুখানি ক্ষান্ত হইলেই তাহার নিকট রওনা হইব। এই অসভ্য বৃদ্ধ সাঁওতালের কলিজার তলে এমন কি অদ্ভুত মণি-রত্ন লুক্কায়িত আছে, যাহার জন্ম আমি পাগল হইলাম ?

বৃষ্টি প্রায় ধরিয়া আসিল। ঘরের কোণ হইতে আমার ছাতিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলাম। অন্ধকার পথের উপর দিয়া কিয়দ্দূর আসিতেই বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল। পথের দুই পার্শ্বে খানা-ডোবা গুলা জলে ভরিয়া চক্ চক্ করিতেছে, এবং তাহারই আশে পাশে ভেকের আনন্দ-কলরব সুরু হইয়াছে !

ধীরে ধীরে টুইলার কুটীর প্রাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এ পথ দিয়া অনেকবার আসিয়াছি, টুইলার খড়ো চালটা মেরামত করিয়া দিবার নিমিত্ত, কোম্পানীর কাজে এই বৎসর বর্ষার পূর্ব্বেই একাধিকবার এখানে আমার আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু আজিকার মত এ স্থানটা এত ভীষণ বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই। অন্ধকার উঠানের পাশে কয়েকটা বৃহদাকার গাছ হইতে বর্ষার জল তখনও টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছিল। খড়ো চালের ছাঁচ গড়াইয়া তখনও জল ঝরিতেছে। অপরিষ্কৃত উঠানের আগাছাগুলার ভিতর ঝিঁঝি-পোকা ডাকিতেছিল ! চালার একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম,—মনে হইল, দুইটা লোক ঘরের ভিতর বিড়্ বিড়্ করিয়া কথা বলিতেছে। ভিতরে বোধহয় কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, তাহারই সামান্য আলোক কবাট-হীন উন্মুক্ত দরজার পথে নির্গত হইতেছে।

আমি সরাসর ভিতরে গিয়া ডাকিলাম, টুইলা !

আমার ভ্রম দূর হইল। দুইজন নয়,—টুইলা একাকী ঘরের মেঝের উপর আপাদ-মস্তক কাপড় জড়াইয়া আপন মনেই বকিতেছিল, আমাকে দেখিয়াই, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। আবার সেই দৃষ্টি ! এ যেন অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত হাতড়াইয়া দেখিয়া লইতে চায় আমি কে, এবং কি প্রয়োজনে আসিয়াছি।

—ও তুই ! বলিয়া, সে মুখ ফিরাইয়া প্রজ্জলিত কেরোসিনের ডিবেটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। আমি নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু ভাবিতেছিলাম, আমার প্রয়োজনের কথা তাহাকে কেমন করিয়া বলি। এতক্ষণে বুড়াকে দেখিয়া মনে হইল, নিতান্ত খাম্-খেয়ালী পাগলের মতই আমি এখানে আসিয়াছি। বুড়ার অতীত ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাটা নিতান্ত অশোভন বলিয়া মনে হইতেছিল, তাই প্রশ্ন করিলাম,—তোকে ত নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, আজ রাঁধিস্ নাই কেন ?

টুইলা গম্ভীর ভাবে বলিল, না।

সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝের উপরেই আমি বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম, টুইলা, আমার একটি কথা রাখিবি?

—কি?

—তুই কি জীবনে খুব কষ্ট পাইয়াছিস্?

—না।

আমি বলিলাম, তুই যে এইরূপ ভাবে একলা থাকিস্,—দেখবার শুনিবার কেউ নাই,—ইহাতে কি তোর কষ্ট হয় না?

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া টুইলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না!

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই কি কখনও বিয়ে করিয়াছিলি?—বৌ বুঝি মরিয়া গেছে?

এইবার তাহার চক্ষুদুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কোন উত্তর না দিয়া আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল। বুড়ার ভাব-গতিক দেখিয়া আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সে যেন তাহার জলন্ত ভাঁটার মত চোখদুইটা দিয়া আমায় পুড়াইয়া মারিতে চায়। ভয়ে-ভয়ে আমি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইলাম, আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। কিছুক্ষণ পরে টুইলা সন্দিগ্ধ-নয়নে আমার দিকে বার-কতক্ কটাক্ষ হানিয়া কাপড়টা বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া, পূর্ব্বের মত শুইয়া পড়িল।

আমি এইবার ধীরে-ধীরে কহিলাম,—বল্ না টুইলা,—বলিতে দোষ কি?

সে এইবার বিরক্ত হইয়া জোরে-জোরে কহিয়া উঠিল, না, না, আমি জানি না। তুই যা বাবু।

নিতান্ত নির্ব্বোধের মত, সামান্য আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া যে অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়াছিলাম, এইবার মুখের মত উত্তর পাইলাম। ঠিক্ ত' যে দুঃখ-দেবতার অনুগ্রহে সে আজ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে—যাহার জোরে সে আজ মরণের দিন পর্য্যন্ত তাহার নিঃসহায় নিরবলম্ব জীবনের অশেষবিধ বেদনা-দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়া, তাহাদিগকে দুঃখ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে অস্বীকার করিতে শিখিয়াছে, সে পরশমণির গোপন-বার্ত্তা যার-তার কাছে বলিয়া বেড়াইবে কিসের জন্য?

আমি সেদিনের মত ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর, কয়েকদিন ধরিয়া বুড়ার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। সংবাদ লইবার তেমন ইচ্ছাও ছিল না।

দিন দুই পরে, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, যে সেই অদ্ভুত জীবটি রাণীগঞ্জ কয়লা-কুঠি হইতে কবে এবং কোন্ সময় হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেছে। কোথায় গিয়াছে, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কেহই অবগত নহে।

কথাটা শুনিয়া অবধি আমার মনটা কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িল। তবে কি আমিই তাহাকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিলাম? না, না, সেকথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। হয়ত এম্‌নি করিয়া যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার পেষা,—হয়ত' এমনি করিয়াই পথের ডাকে সে তাহার ঘরের সুখ-সুবিধা, আশ্রয়ের শান্তি, বারে-বারে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়।

তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর, কর্ম্মচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক নূতন-নূতন কয়লা কুঠিতে কাজ লইয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু সে বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাই নাই।

তপ্‌সী কয়লাকুঠিতে চাকরী লইয়া আসিলাম। স্থানটা আমার পছন্দ হইয়াছিল। আমার বাসার পাশেই 'সিজারণ' নদী,—সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তরের উপর পুষ্পিত পলাশের বন। বহু পুরাতন পরিত্যক্ত কয়লা-কুঠিগুলা এখন নানা শ্রেণীর বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার বুকের মধ্য দিয়া চলাচলের একটা সরু লাল কাঁকরের পথরেখা বরাবর রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। জঙ্গলের মাঝে কয়েকটা পুরাতন ইটের বাড়ী ও চিম্‌নিগুলা দাঁত বাহির করিয়া কঙ্কালসার অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। মানুষে আর তাহাদের যত্ন লয় না বলিয়া প্রকৃতিমাতা ধীরে-ধীরে এই অযত্ন পরিত্যক্ত মানবকীর্ত্তিগুলিকে নিজের কোলে টানিয়া লইতেছেন। তাহাদের ভগ্ন প্রাচীর বহিয়া লতাগুল্ম উঠিয়াছে,—ফাটলের ভিতর গাছ গজাইয়াছে,—ইটের উপরে শ্যামল শ্যাওলার রং ধরিয়াছে।

একদা সন্ধ্যার পূর্ব্বে অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে কুঠির একজন চাপ্‌রাশী আসিয়া সংবাদ দিল, সাত নম্বর কুলি-ধাওড়ার পাশে যে পলাশ-বনটা আছে, সেইখানে বসিয়া কয়েকজন কুলি জুয়া খেলিতেছে,—আপনাকে একবার যাইতে হইবে।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখিলাম, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত প্রান্তরের উপর একটা গাছের তলায় কয়েকজন ছোক্‌রা জুয়াখেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই অন্য সকলে ছুটিয়া পলাইল,—মাত্র একটা পনর-ষোল বছরের ছোক্‌রা পলাইবার পথ না পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া ঠিক্ সাঁওতালের ছেলে বলিয়া মনে হইল না। গায়ের রং তত বেশী কালো নয়,—চোখের তারা দুইটা বিড়ালের মত।

আমাকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সে পিছন্ ফিরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমিও বাধ্য হইয়া তাহার পিছু ছুটিলাম। সাত নম্বর কুলিধাওড়ার যে ঘরটায় সে ঢুকিয়া পড়িল, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইমাত্র সে ঘরে ঢুকিয়া কোথায় চলিয়া গেল? বাহিরের এক ঝলক্ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছে। আস্‌বাবপত্রের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়ি কল্‌সী এবং একটা তীর-ধনুক ছাড়া আর কিছুই নাই। ঘরের একদিকের একটা অন্ধকার কোণের উপর কে একটা লোক জীর্ণ মলিন শয্যার উপর জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার গায়ে একটা কাপড় জড়ানো। ছেলেটা তাহারই পাশে কোথাও লুকাইয়া আছে ভাবিয়া, পকেট হইতে

দেশালাই বাহির করিয়া জ্বালিলাম। সম্মুখে একটা কেরোসিনের ডিবে পড়িয়াছিল, সেইটা ধরাইয়া দিতেই, সেই সামান্য আলোকে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলাম, ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বিছানার নীচে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অসাবধনতাবশতঃ তাহার পা দুইটা ঢাকা পড়ে নাই। আমি ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতে গেলাম কিন্তু শায়িত রোগীর মুখের পানে তাকাইয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিলাম, এ সেই বৃদ্ধ টুইলা ব্যতীত আর কেহ নহে।

আলোটা তাহার মুখের নিকটে ভাল করিয়া তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, টুইলা, তুই এখানে থাকিস্ নাকি ?

টুইলার চোখের সে ভয়ানক জ্যোতি আর নাই,—জীবন নদীর খেয়াপারে আসিয়া এখন তাহার অনেকখানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সে আমার মুখের পানে অনেকক্ষণ ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর চিনিতে পারিয়া বলিল,—তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্ বাবু ?

বলিলাম, এই ছেলেটাকে ধরিয়া লইয়া যাইব,—সে জুয়া খেলিতেছিল।

টুইলা স্পষ্ট বলিল, কই, এখানে কোন ছেলে থাকে না।

সে হয়ত ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই।

ছেলেটা যে ভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, ভাবিলাম, আর বেশীক্ষণ সে অবস্থায় থাকিলে হয়ত দম বন্ধ হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিবে, তাই তাহার পা ধরিয়া টানিয়া দিয়া বলিলাম, ওঠ—তোর ভয় নাই।

ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে বিছানার তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

টুইলা একবার ছেলেটার মুখের পানে তাকাইল, পরে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ইহার জন্য আমার রৌপ্পাকে আর শাস্তি দিস্ না বাবু। সে সখ করিয়া জুয়া খেলে নাই,—আমাকে বাঁচাইবার জন্য, আমার ঔষধের দামের জন্য সে জুয়া খেলিয়া রোজগার করিতে গিয়াছিল।...এই খানে ভাল করিয়া বসিয়া শোন্—তোকে আজ সব কথাই খুলিয়া বলি।

আবার সেই পূর্ব্বের কৌতুহল জাগিয়া উঠিল! চাপরাশীকে বিদায় করিয়া দিয়া বৃদ্ধের শিয়রের নিকট গিয়া বসিলাম। অদূরে কেরোসিনের ল্যাম্পটা মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

সে বলিতে লাগিল, আমি মরিয়া গেলে রৌপ্পাকে স্নেহ যত্ন করিবার লোক দুনিয়ায় আর কেহই থাকিবে না, তাহা সে জানে এবং সেই জন্যই সে প্রাণ দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। আমিও শুধু তাহারই জন্য মরিতে পারিতেছি না।

টুইলা হঠাৎ থামিয়া গেল। রৌপ্পার দিকে তাকাইয়া বলিল,—রৌপ্পা, তুই এখন বাহিরে যা।

রৌপ্পা ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। টুইলা বলিল,—রাণীগঞ্জের কুঠিতে তোকে একদিন

তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, সে কথা আমার মনে আছে।...কথা এমন বেশী কিছু নয়, তবে তুই জানিতে চাহিয়াছিলি বলিয়াই জানাইতেছি।...

প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি চোর,—আমি খুনী আসামী! একমাত্র ওই ছেলেটার জন্য আমি আজ পর্য্যন্ত নিজের কাছেই সেকথা গোপন রাখিয়াছি। আর আমার ধরা পড়িবার ভয় নাই,— আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।

তখন আমার জোয়ান্ বয়স। ঝরিয়ার কাছে একটা কুঠিতে কাজ করিতাম। আমার স্ত্রীর নাম ছিল মতিয়া। সে ছিল ঠিক পরীর মতন সুন্দরী। গাছ যেমন মাটিকে ভালবাসে,—পাখী যেমন আকাশকে ভালবাসে, সেও আমাকে তেমনি ভালবাসিত। তাহাকে পাইয়া কুঁড়ে ঘরে বসিয়াও আমি ভাবিতাম রাজা হইয়াছি। যাক্, তাহার কথা বেশী বলিতে গেলে হয়ত তোকে আর কিছু বলা হইবে না।

আমাদের যে ম্যানেজার সাহেব ছিল, তাহার স্বভাব ছিল বড় খারাপ। সে আমাদিগকে পা দিয়া দলিত। ভাবিত, ছোট-জাতের ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সাহেব মাহিনা দিয়া একটা লোক রাখিয়াছিল,—পয়সার লোভ দেখাইয়া, জোর-জবরদস্তি করিয়া সাহেবের নিকট ছুকরী মেয়েদিকে লইয়া গিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করানই ছিল সে লোকটার কাজ।

আমার মতিয়ার উপর সে শয়তানের যে কখন্ নজর পড়িয়াছিল জানি না। আমি কাছে থাকিলে মতিয়ার গায়ে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

একদিন হাসি-ঠাট্টা করিয়া মতিয়াকে বলিয়াছিলাম,—আচ্ছা মতিয়া, সাহেব যদি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তুমি কি করিবে?

মতিয়া রাগিয়া উঠিত, বলিত, ছেলে-খেলা কি না?

আমি খুব জেদ্ ধরিয়া বসিলে বলিত, জলে ডুবিয়া মরিব।

রথযাত্রার দিন মতিয়াকে লইয়া শিয়ারশোলে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ লোকের গোলমালে মতিয়াকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খুঁজিলাম, তন্ন-তন্ন করিয়া প্রত্যেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেখানে তাহার সন্ধান মিলিল না। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিলাম,—সেখানেও নাই। আবার রথ তলার দিকে ছুটিলাম। আবার ফিরিলাম। সাহেবের বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কুলিধাওড়ায় সন্ধান লইলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে মতিয়াকে পাওয়া গেল না।

পরদিন দুপুরে সংবাদ পাইলাম, শিয়ারশোলের রাণীসায়রের জলে মতিয়ার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছে।...পাগলের মত ছুটিয়া গেলাম, কিন্তু তখন আর গেলেই বা কি হইবে! সে ত' আমাকে আগেই বলিয়াছিল! পুলিশের হাঙ্গামা মিটাইয়া আমি তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিলাম।

প্রতিহিংসা লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলাম। দিনকতক পরে একদিন শুনিলাম, সাহেব

কি একটা কাজের জন্য আসনশোলে গিয়াছে। সঙ্গে বিষাক্ত তীর লইয়া রাত্রির অন্ধকারে বাংলার দিকে চলিতে লাগিলাম।

রাত্রি যে কত হইয়াছিল, ঠিক জানি না। সাহেব তখনও ফিরে নাই। বাহিরের বারান্দা হইতে দেখিলাম, একটা ঘরের মেঝের উপর খানসামা দুইজন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। মাঝের ঘরে, দেওয়ালের গায়ে একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম, একটা পালঙ্কের উপর মেম্ সাহেব শুইয়া আছে। কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহারই উদ্দেশে তীর ছুঁড়িলাম। বিষাক্ত তীর তাহার মাথার উপরে বিঁধিয়া গেল। তাহাকে আর উঠিতে হইল না। চির জন্মের মত ঘুম পাড়াইয়া দিলাম। মতিয়ার মৃত্যু ভুলিয়া গেলাম,—নিজেকে ভুলিলাম, জগৎ-সংসার ভুলিলাম। আনন্দে তখন আমার বুক নাচিয়া উঠিয়াছে। সাহেব যখন আসিয়া দেখিবে, তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, তখন বুঝিবে, মতিয়া মরায় আমার প্রাণে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে।

তীরখানা তাহার মাথা হইতে তুলিয়া লইবার জন্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখি, মৃত জননীর পার্শ্বে একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছেলে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতেছে। তাইত!—তখন আমার ভাবিবার সময় ছিল না। কচি ছেলেটিকে একহাত দিয়া বুকে তুলিলাম, অন্যহাতে তাহার মাতার মস্তক হইতে বিষ-বাণখানা টানিয়া বাহির করিলাম। আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেলাম।

তাহার পর সেই ছেলেটাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যে কষ্ট পাইয়াছি, একটি একটি করিয়া সে-সব কথা বলিবার ক্ষমতা আজ আমার নাই। সাহেবের ছেলে আমাদের মত কালা-আদমীর কাছে নিজের ছেলে বলিয়া প্রচার করাও চলে না। সাঁওতাল পরগনার এক পাহাড়ের পাশে আমাদের যেখানে আদি বাসস্থান,— সেখানে আমার এক বোনের কাছে তাহাকে রাখিয়া আসি। তাহার পর বোনও যখন কয়লাকুঠিতে চাকরী করিতে আসিল, তখন তাহাকে আর কোথায় ফেলিয়া আসিবে? সঙ্গে লইয়াই আসিল। রৌপ্পার রংটাও তখন ময়লা হইয়া গিয়াছিল,—সাঁওতালী কথাও বেশ বলিতে পারিত।... আমি মরিয়া গেলে রৌপ্পাকে মাঝে-মাঝে দেখিস্ বাবু!..

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই টুইলা চুপ করিল।

আমি বলিলাম, আজ তবে আসি।

—আচ্ছা যা। রৌপ্পাকে দেখিতে পাইলে পাঠাইয়া দিস্। তাহাকে যেন এসব কথা বলিস্ না বাবু।

আমি বাহিরে আসিলাম, কিন্তু রৌপ্পাকে দেখিতে পাইলাম না।

পরে কোম্পানীর কাজে দিনকয়েকের জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে হইল।

অভাগা

আমি একটা 'ফ্যামিলি কোয়াটার' পাইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমার স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাইব মনে করিয়া দেশে গেলাম।

টুইলার কথা আমি রাখিতে পারি নাই। তাহার নিষেধ স্বত্বেও আমার স্ত্রীকে তাহার জীবন-কাহিনী শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, কুঠিতে গিয়া রৌপ্পাকে আমার কাছে একবার আনিও। আমি তাহাকে দেখিতে চাই।

সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম। রৌপ্পাকে ডাকিবার জন্ম সেদিন রাত্রে সাত নম্বর কুলিধাওড়ায় গিয়া তাহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম, টুইলা মারা গেছে এবং তাহার পরদিন হইতে রৌপ্পা ধাওড়া ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে কেহ বলিতে পারে না।

নদীর কিনারে যে পথটি গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম। নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধ স্পর্শে উলসিত বনানী মাতালের মত টলিতেছে। রক্তবর্ণ পলাশের ফুলগুলি নদীজলে প্রতিফলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে। শ্যামা বসুন্ধরার এই সজীব সৌন্দর্য্যের মাঝে পথ চলিতে চলিতেও আমার চিত্ত, বারে-বারে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল!...পিতৃহীন, মাতৃহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন কোন্ এক পথের কাঙ্গাল, তাহার উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া এতক্ষণ হয়ত' ঠিক আমারই মত কোন্ এক অজানা প্রান্তরের উপর পথ চলিতেছে, কে জানে!

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

স্মৃতির

(১)

সুখের ধারাটা উদ্দাম গতিতে ছুটে আসে। মাতালের মত খানিকক্ষণ মাতামাতি করে সে হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়। রেখে যায় জীবন-বেলাভূমিতে একটা চিহ্ন। মানুষ সারা জীবন এ চিহ্নটাকেই নিবিড় ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে। জীবন যাত্রায় এটাই তার বড় সম্বল।

নীল সমুদ্রের উপর 'বাতিঘর' দেখেছ?—ভারী সুন্দর দেখায়। শুধু আলো বলে সে সুন্দর নয়,—আলোর সন্ধান দেয় বলেই সে এত সুন্দর। অনন্ত সমুদ্র যে দিকে চোখ যায় কেবল নীল—কেবল জল। সেই অনন্ত নীল সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে অসহায়ের মত জাহাজগুলি বাতিঘরের আলো দেখে পারের খোঁজে চল্‌ছে। জীবন তরণী তেমনি চিরকাল অতীত সুখের স্মৃতির আলোককে কাণ্ডারী করে অনন্ত সংসার সমুদ্রের দুঃখের নীল তরঙ্গে পাড়ি দিয়ে পারের খোঁজে চল্‌ছে। এ চলাতে আনন্দ আছে,—কিন্তু এতে বেদনাও কম নয়।

ও গো! আমার এই লুটিয়েপড়া জীবনেও একদিন একটা সুখের স্রোত তুমুল কলরোল তুলে ছুটে এসেছিল। আমার সেই হঠাৎ-পাওয়া সুখ আর নেই—আছে সেই বিগত সুখের স্বপ্নমধুর স্মৃতির সৌরভ। মনে রেখো, সর্ব্বহারার এটাই কিন্তু সর্ব্বস্ব। এই স্মৃতি সম্বল করেই এখনো বেঁচে আছি।

সত্যি বল্‌ছি, আমার জীবনে একদিন শুভক্ষণ এসেছিল, এসেছিল বলেই'ত আজকের এই অশুভক্ষণটা কেটে যাচ্ছে।

(২)

বাবা আমার বড় কণ্ট্রাক্টার। তা ছাড়া তিনি দুটো নামজাদা কোম্পানীর কর্ত্তা,—নিজেরও কয়েকটা কয়লার খনি আছে। সাহেব মহলেও বেশ নাম একটা উপাধিও পেয়েছেন। বাড়ীতে 'ডিনার' পার্টি ত লেগেই আছে। কল্‌কাতায় এমন নামকরা বড় কেউ নেই, যিনি মিষ্টার রায়ের বাড়ীতে ডিনার না খেয়েছেন।

আমি তার একমাত্র মেয়ে,—প্রচুর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বিলাতী শিক্ষার যত কিছু কুফল আছে সবগুলি আয়ত্ত করবার প্রচুর সুবিধা তিনি আমাকে দিয়াছিলেন;—দেন নি কেবল মানুষ হয়ে সংসারে কাজ করবার শিক্ষাটা।—কই, আমিও ত সেটা পাওয়ার জন্যে তেমন ব্যগ্র ছিলাম না। আজ সে অভাবটা বড় তীব্রভাবে বুকের ভিতর লাগ্‌ছে। আমার

যত অন্যায় আব্দার বাবা তা সবই ন্যায়ের নামে আনন্দের সাথে পূর্ণ করে গেছেন, এটা ভেবেই আজ আমি ভারী আশ্চর্য্য হই। আমার কোন কাজের প্রতিবাদ ভুলেও কেউ একদিন করেছিল বলে মনে পড়ে না। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। বোধ হয় তারা বিভোর হয়ে ভাবিত,—"রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়।"

* * * * * * *

আমার জন্মদিন উপলক্ষে বাড়ীতে খুব উৎসব। আমার বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কয়েকজন অবিবাহিত যুবক, ব্যারিষ্টার বানার্জ্জি, মিষ্টার ভোস্, মিষ্টার প্যালিট্‌ প্রভৃতিরও নিমন্ত্রণ ছিল। হাসি তামাসায় ড্রইংরুমটা মুখরিত। এসব হল্লাতে লোকে আর যাই ভাবুক,—পর্দ্দানশীন ভাবিবার উপায় ছিল না। অতিথি অভ্যাগতদের কলরোলে ঘরটা যখন সরগরম হয়ে উঠেছিল, তখন বাবা ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে তাঁর একটি তরুণ যুবক। আমার চোখে এমন রূপ—এমন তেজস্বী রূপ খুব কমই পড়েছে। মনে হয় যেন সারা ঘরটা আলোতে ভরে গেল। ভাল করে তাঁর দিকে তাকাতে পারলেম না—মাথাটা আপনা হতে যেন হেঁট্‌ হয়ে পড়ল। পুরুষকে দেখে এই প্রথম চোখ নামিয়েছি। সম্ভ্রমে--না—লজ্জায় ঠিক জানি না।

বাবা বল্লেন,—"নিরু, তোমার সঙ্গে এর পরিচয় করে দি। এঁর নাম মিষ্টার অরুণচন্দ্র ঘোষ। যেমন খাসা চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমার ফার্ম্মে এখন কাজ করছে—শীগ্‌গিরই বিলেত যাবে। এমন চৌকস ছেলে আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।" বাবার কথায় ওদিকে ত ভদ্রলোকটি লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেলেন। বাবা, পরিচয় করে চলে গেলেন কিন্তু সেই সঙ্গে নবাগতটিকে ভারী বিপদে ফেলে গেলেন। বয়স্কা কুমারীর সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করিতে তিনি বোধহয় মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অস্বস্তিভাবটা তাঁর চোখে, মুখে বেশ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল,—তিনি তা চাপিয়ে রাখ্‌তে পারেন নি। আমি তাঁকে নমস্কার করেছি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে যে প্রতিনমস্কার করতে হয় সেটা বোধহয় তাঁর আদৌ স্মরণ ছিল না। এসব ভুল আমি কখনও সহ্য করি না, তাঁর বেলায় কিন্তু এই ভুলটা আমার বেশ ভালই লেগে ছিল। এই নবীন অতিথিটির দিকে সবাই এমন ভাবে তাকিয়ে ছিলেন যে সেটা মোটেই শোভনীয় নয় কিছুক্ষণ পরেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"আমি চল্লুম!" আমি এই অপ্রত্যাশিত কথায় আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম—"সে কি? একটু চা খাবেন না?" "না, ওসবে আমার রুচি নেই।" "কিছু খাবার আনি?" "না, আপনার কোন কষ্ট করতে হবে না।" এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন। আমিও তাঁকে এগিয়ে দিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লুম—"যদি কিছু মনে না করেন, মাঝে মাঝে আস্‌বেন।" তিনি চলবার পথেই ধাঁ করে বলে ফেল্লেন—"হাঁ, আসব।" তিনি চলে গেলে কেবলি ভাবতে লাগলুম,—যাদুকরের মত কি অদ্ভুত মন্ত্রই না এ লোকটি জানে! এমন করে অপমান করে চলে গেল তবু তারই পায়ের ওপর আছড়ে কেঁদে তাকে ফিরিয়ে আনতে মনটা কেবলি

আকুলি বিকুলি করছে। এসেছিল শান্তি ও তৃপ্তি নিয়ে, চলে গেল শূন্যতার আর্ত্তনাদে এ হৃদয়টাকে তিক্ত করে। ওগো আমার হঠাৎ-দেখা অতিথি, তুমি এত নিষ্ঠুর!

তিনি চলে যেতে না যেতেই তাঁর সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। কত বৎসর চলে গেছে সেদিনের সেই ঝাঁঝালো আলোচনা আমার বুকের পাঁজরগুলি ভেঙ্গেচুরে তেমনি তীব্রভাবে কামানের মত বারুদের হল্কা ছুঁড়চে।

মিষ্টার বোনার্জ্জি বল্লেন,—"দেখলেন মিস্ রায়, লোকটা কি অসভ্য?" বোনার্জ্জি সাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিপুল তেজে মিষ্টার ভোস্ বল্লেন,—"একেবারে আস্ত জানোয়ার। আপনার নমস্কারটি পর্য্যন্ত নিলে না। আপনি দয়া করে চা খেতে বল্লেন, এটা ওর সাতপুরুষের ভাগ্য বল্‌তে হবে, বেটা ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা দেখুন, তা পর্য্যন্ত খেলে না। এসব দেখে শুনেই ত 'নেটিভ্' দেখলেই ঘৃণায় ক্রোধে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।" মিষ্টার প্যালিট্ এতক্ষণ বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধরেছিলেন কিন্তু এবার অধৈর্য্য না হয়ে পারলেন না। তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাতের আস্তিন গুটিয়ে হাত নেড়ে তর্জ্জন করতে লাগলেন—"মহিলার অপমান? অসহ্য! বুঝলেন মিস রায় এজন্যে আপনার বাবাই দায়ী। তিনিই ত ভূতটাকে এখানে নিয়ে এসে এইসব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছেন। দেখে নেবেন মিস্ রায়, এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে 'প্যালিট্' ছাড়ছে না।"

হায় আমার বুকে তখন কি ঝড় বইতেছিল কে তার খোজে রাখে!

(৩)

বাবা মা'র সাথে কি একটা পরামর্শ করতেছিলেন, এমন সময় আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বল্লেন,—'এস নিরু, তোমার কথাই হচ্ছিল!" মা'র দিকে তাকাতেই দেখি মা মুখ টিপে হাসছেন। বুঝতে বাকী রইল না যে আমার বিয়েরই একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বাবা, আমাকে তাঁর পাশে টেনে নিয়ে বল্লেন,—"তোমার মা আর আমি দুজনেই এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, কখন যে ডাক এসে পড়ে কে জানে? অরুণ ছেলেটিকে আমাদের দুজনেরই বড় পছন্দ হয়েছে, ও তোমার অযোগ্য হবে না। কি বল নিরু?" অসহ পুলকে আমার মনটা ভরে গেল। বাবার কাছে আমার কোন দিনই সঙ্কোচ ছিল না—বললুম—"তাঁর কি এ বিয়েতে মত হবে?" "হাঁ মা, অরুণের মত পেয়েছি, এখন তোমার মত হলেই হয়।" লজ্জার আনন্দে আমি তখন একেবারে রাজী হয়ে কোন রকমে বলে ফেল্লাম—"তা, তোমরা যা ভাল বোঝ তাই করবে, আমি কি জানি!

* * * * *

কে জানত এ লোকটির হাতেই ভাগ্য বিধাতা আমার ভাগ্যের চাবিটি দিয়ে রেখেছেন!

বিয়ের সম্পর্কে এতদিন যত জল্পনা কল্পনা করেছি একটা উত্তাল হাওয়া এসে তা কোথায় চোখের পলকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। মানুষের কল্পনাটাই এমনি। আতসবাজীর মত আস্ফালন করে আকাশ ছুঁতে ছুটে যায়, হাওয়ার একটা ধাক্কা খেয়ে ধাঁ করে আপনাকে হারিয়ে দিয়ে মাটীয়ে লুটিতে পড়ে।

আমার বিয়ের সংবাদ শুনে সেদিনই সন্ধ্যার সময় মিষ্টার 'ভোস্' আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। তোর চোখে মুখে এমন একটা বিজাতীয় প্রতিহিংসার স্পৃহা ফুটে বেরুচ্ছিল, যা দেখলে ভয়ে প্রাণটা শুকিয়ে ওঠে। আমার বিয়ের সংবাদে এমন একটা ভাব যে তার হবে তা আমি আগেই ধারণা করেছিলাম। তিনি নিতান্ত উত্তেজিতভাবে বল্লেন "শেষকালে আপনি ওই জানোয়ারটাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন? আপনার বাবা বুড়ো মানুষ তাঁর না হয় ভুল হতে পারে কিন্তু আপনার মত সুশিক্ষিতা কি করে এমন ভাবে ক্ষেপে যাবেন, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।" রাগ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না কিন্তু এ অপমান 'বরদাস্ত' করতে পারলুম না। খুব তেজের সহিত বললুম,—" মিষ্টার 'ভোস', আমার বিয়ের সম্পর্কে কোন আলোচনা করবার অধিকার আপনার নেই; অন্ততঃ আমার বাড়ীতে। আপনার মত অভদ্রের সঙ্গে আলোচনা করাত দূরের কথা, একটা কথা বলতেও ঘৃণা বোধ হয়।" কথার মুখে এমন একটা আঘাত পেয়ে মিষ্টার ভোস্ একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন। কোন রকমে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেন বাঁচিলেন।

(৮)

হাঁ, বিয়ের রাত্তেই বুঝেছি, লাজুক হলেও তাঁর ভিতরে খাঁটী মানুষের তেজ আছে,— একটা বিশিষ্টতা—একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। বাবার অফিসে যিনি কাজ করেন, বাবার সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করে কোথায় তিনি ধন্য হবেন, না বিয়ের রাত্তেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন— "নিরু, এখন আমার বিয়ে করবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু একটা কারণে বিয়েটা করে ফেলেছি। তোমার বাবা আমাকে তাঁর অফিসে কাজ দিয়ে যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আজ সুযোগ পেয়ে সেই অনুগ্রহের ঋণটার কতক শোধ করে ফেলেছি। আমি আজ অনেকটা ঋণমুক্ত।" কথাগুলি যেন আমার দুর্জ্জয় অহঙ্কারকে বিদ্রূপ করে নির্ম্মমভাবে আমার বুকের উপরে 'সপাসপ, চাবুক মেরে গেল। উত্তর দেওয়ার কোন ভাষাই খুঁজে পেলুম না। বিয়ের পরে বাবা, এ বাসাতে থাকতে তাঁকে কত অনুরোধই না করেছেন কিন্তু অভিমানী তিনি, মাথা হেঁট হবে বলে কষ্ট করে মেসে থাকতেন; তবু ভুলেও শ্বশুরবাড়ীর 'পোলাও'র দিকে লোভ করে নজর দিতেন না। মাঝে মাঝে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে যেতেন এই যা।

*　　*　　*　　*　　*

আমরা ছুটীতে পুরী এসেছি কিন্তু তিনি আসেন নি। আমার ধারণা ছিল তাঁর এ অভিমান

টিঁকবে না—টিঁকতে পারে না, শ্বশুরবাড়ীতে আসতেই হবে। মানুষের সকলের চেয়ে বড় ভুল যে সে তার নিজের মনের ছবিই সকলের ভিতরে আঁকা দেখতে চায়।

সেদিন সপ্তমীপূজা, একটু তাড়াতাড়ি বের হব বলে যেই গেটের কাছে এসেছি ডাকপিয়ন চিঠি ও একটা পার্শ্বেল দিয়ে গেল। তিনি পাঠাবেন পার্শ্বেল, আমি ত প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারি নি। ভেবেছি কেউ তাঁর নাম দিয়ে দুষ্টুমী করেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পার্শ্বেলটা খুলে দেখি, হাঁ তিনিই পাঠিয়েছেন; সঙ্গে আমার নামে তাঁর একখানা পত্রও আছে। জিনিষ দেখে আমি ত অবাক। এ বিদ্রূপ করবার কি দরকার! আমার কি কাপড় তেলের অভাব আছে যে তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছি। তিনি পাঠিয়েছেন একখানা ছবি, ছবির ভাবটি এই যে একটি বাঙ্গালী রমণী খদ্দর পরে চরকা কাটছেন—ছবির নীচে লেখা 'গৃহলক্ষ্মী'। অর্থ এই যে আমিও যেন একটি গৃহলক্ষ্মী হয়ে বসে বসে চরকা কাটি। আর পাঠিয়েছেন একখানা খদ্দরের শাড়ী আর এক শিশি "নিরুপমা" তেল। আমার নামের তেল পাঠান হয়েছে। লোকটির মনে কবিত্বের একটু স্পন্দনও আছে তবে। চিঠিতে লেখা,—

"নিরুপমা,

পূজার দিনে দেশের কয়েকটা জিনিষ উপহার দিতেছি। স্বামীর ভালবাসার দান গ্রহণ করো।—অরুণ"

ভারী ত জিনিষ, তা আবার উপহার। মা বাবা দেখলে কত না হাসাহাসি করবেন। আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তাড়াতাড়ি পার্শ্বেলটা ট্রাঙ্কের ভিতরে লুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

হায়, হতভাগিনী একবারও ভাবনি ওই উপহারের মধ্যে যে স্বামীর কি অগাধ ভালবাসা—প্রেমিকের হৃদয়ের কি অম্লান মাধুরী লুকিয়ে আছে!

(৩)

কলিকাতায় তখন পিকেটিং এর খুব ধুম। তার এক দলের পাণ্ডা হয়েছেন তিনি। এ কি খেয়াল? না, তিনি ত ঝোঁকের মাথায় কিছু করবার লোক নন। একদিন দুপুরে হঠাৎ বাসায় এসে উপস্থিত। সে চেহারা দেখে ভয়ে আমার প্রাণটা শিউরে উঠল। সে কান্তি আর নেই—চুল গুলো রুক্ষ, পায়ে এক রাশ ধূলো, পরণে একখানা মোটা খদ্দর। তিনি কিছু না বলতেই আমি বলে ফেল্লুম—"সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এ কি পাগলামো করছ? ছিঃ ছেড়ে দাও এসব।" একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে উত্তর দিলেন—"হাঁ বাজে কাজ সব ছেড়ে দিয়েছি। যে কাজে নেবেছি, এর কাছে সব কাজই তুচ্ছ। এটাকে পাগলামো ভাবতে পার, তা ভাব। মানুষের জীবনটাই একটা পাগলামো, আমি পাগল হব তা আর বেশী কি!" "এ ভাবে চললে

যে তুমি আর বাঁচবে না।" "যে ভাবে আমরা বেঁচে আছি এটাকে যদি বাঁচা বল তাহলে এ বাঁচা আমি চাইনে।" তারপরে নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে বললেন—"এর চেয়ে একেবারে মরা ঢের ভাল।" "তুমি এরকম ছন্নছাড়া হলে বাবার যে অপমান হবে।" "অপমান? আমাদের কি মান আছে যে তার অপমান হবে! মান অপমান মানুষের হাতে গড়া জিনিষ, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোই জীবনের আদর্শ নয় বলেই আমার মনে হয়। যাক্ এ সব কাজের কথা, আমি যে কথা বলতে এই দুপুরে এসেছি তাই বলি। আমার ইচ্ছে—মনে রেখো এটা স্বামীর ইচ্ছে—তুমি ভোগের অনাচার হতে ত্যাগের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়। চারদিকে হাহাকার শুনচ না! এখনও ত্যাগের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়, এই সুযোগ, তোমার পরিচয় দিয়ে আমি যেন সকলের মাঝে গর্ব্ব করতে পারি।" "তুমি কি ক্ষেপেছ?" তিনি কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আর এ বাড়ীতে ফিরে আসেন নি। ওগো, তুমি আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলে না কেন তখন? তুমি যদি নিতে কেও কি কিছু বল্‌তে পারতো? তোমার অধিকার তুমি এ ভাবে ছাড়লে কেন?

তারপর শুনলুম পিকেটিং এর অপরাধে তাঁর জেল হয়েছে। বাবা, বহু চেষ্টা করে তাঁর মুক্তির আদেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তি চাননি। চাইবেন কেন? আমিও ফিরাতে গেয়েছিলেম কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে এসেছি।

আমরা মিথ্যাই শুধু ভেবেছি—জেলের পরিচয়ে তিনি আবার ওসব ছেড়ে খাঁটি পথে আসবেন। হাঁ, ঠিক পথেরই সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু আমরা যে পথের আশা করেছিলেম সে পথ নয়।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

রাত্রিতে কি ভীষণ স্বপ্নটাই না দেখেছি। ঘুম হতে মাত্র উঠেছি, শুনিলাম বাসায় খঞ্জনী বাজিয়ে এক বৈরাগী গাইছে,—

"ভিখারীর বেশে এল মহারাজ, কেন হেলা করে ফিরিয়ে দিলি—"

চোখের জল আর রাখতে পারলুম না। উঃ, বুকের ভিতরে তখন কি আর্ত্তনাদ!

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

সব শেষ। মেদিনীপুরের জেলের জেলার বাবার কাছে লিখেছেন,—টাইফয়েডে মারা গেছেন। তাঁর কোন আত্মীয় স্বজনের নাম জানতে না পারায় পীড়ার সংবাদ আগে জানাতে পারেননি। তিনিও কোন নাম জানান নে। মৃত্যুর পরে তাঁর বালিসের তলায় দুখানা চিঠি পাওয়া গেছে। এক খানা বাবার নামে আর এক খানা আমার নামে। সে চিঠি হতে ঠিকানা পেয়ে জেলার বাবার কাছে এ দুঃসংবাদ পাঠিয়েছেন। আমাকে বিদায় সময়েও ভোলেননি—লিখেছেন,—

"চললুম, চিরদিনের জন্য চললুম। আবার বলি পারত ত্যাগের পথে এসে নারী-জীবন সার্থক করো"। বাবাকে শুধু লিখেছেন,—

"জীবনে যাকে পেয়ে সুখী হন নি মৃত্যুর পরে তার স্মৃতি যেন আপাকে কোন বেদনা না দেয়।"

(৬)

অভিমানী! ফিরে এস, দেখে যাও, তোমার স্ত্রী পথের সন্ধান পেয়েছে, তুমি এসে তাকে হাত ধরে সে পথে নিয়ে যাও। জীবনে যে ভুল করেছি সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। নিষ্ঠুর! এস, আর ভুল হবে না, এস। একবার শুধু এস! প্রিয়তম! [illegible] বড় কঠোর শাস্তি দিয়ে লুকিয়ে চলে যাবে তা হবে না। শাস্তি যদি দিতে হয় তুমি নিজে এসে দিয়ে যাও, আমি মাথা পেতে নেব। অমন করে আড়াল দিয়ে গেলে চলবে না, তোমায় আসতে হবে।

শরৎ তার সৌরভ নিয়ে ধরণীর বুকে ফিরে এসেছে। ওগো আমার গোপন-সুরভি, তুমি কি ফিরে আসবে না? তোমার পূজার উপহার আমি বুকে করে আছি, দেখে যাও। তোমার উপহার আর কখন অনাদৃত হবে না, তুমি এস। আমার সর্ব্বস্ব, ফিরে এস, আমার দয়িত, ফিরে এস।

শ্রীশ্রীপতিপসন্ন ঘোষ

চীনা-বাদাম

কাজেরলোক।

প্রভু (কর্ম্মচারীর প্রতি) দেখ বাবু! এখানে তোমার পোষাবে না আমার চাই খুব চট্‌পটে কাজের লোক যাদের মুখে কথা নেই অথচ হাত পা চলে খুব জোর। তোমার মত মেদামারা লোকের দ্বারা—

কর্ম্মচারী—যে আজ্ঞে—তাহলে আমার ভাইকে এনে দেব তার মিরগীর ব্যামো আছে—একবার চাগলে মুখে রা বেরুবে না অথচ হাত পা চলে যেন কলের গাড়ী

প্রেমের অন্ধত্ব।

বিবাহ-পণ-নিবারণী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে যোগেনবাবু বলিলেন "প্রেম যে অন্ধ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পাশ্চাত্যে কেন, আমাদের ভারতেও দুর্লভ নহে; তাহা না হইলে কন্যার পিতার গলায় গামছা দিয়া বিবাহের পণস্বরূপ প্রচুর অর্থ আদায় করিবার অব্যবহিতপরে ফুলশয্যায় শুইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতে নিশ্চয়ই বরের চক্ষুলজ্জা হইত।"

অকাট্য যুক্তি শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ তুষ্ণীভূত।

হাতবুলিয়ে চিকিৎসা।

প্রত্নতাত্ত্বিক—পুরাকালে আমাদের দেশে একরকম চিকিৎসা প্রচলিত ছিল যাতে ব্যাধি-দুষ্টস্থানে হস্তামর্ষণ করে আরোগ্য করা হতো, এতেই বোঝা যায় যে হাতবোলানর শক্তি অদ্ভুত—

জনৈক বন্ধু—তাতে আর কোন ভুল নেই—আমার ছোট ছেলেটা খালি খেলিয়া বেড়াত, পড়াশুনা মোটেই কর্ত্তো না—দিন দুইচার তার কাণে কসে হাত বোলাতে সে ব্যায়রাম সেরে গেল, মেজটা সিগারেট ধরেছিল—তারগলে চটাপট্ করে হাত বোলাতে এখন ধূমপান পরিত্যাগ করে ঠাণ্ডা হয়েছে—বড়টা লক্ষীছাড়া হয়ে বেশ্যাবাড়ী যাতায়াত সুরু করেছিল—একদিন তার গলায় হাত বুলিয়ে দরজার বের করে দিতে সে ব্যাধি মুক্ত হয়েছে,

প্রত্নতাত্ত্বিক—নিবিষ্ট মনে থিসিসের উপকরণ ভাবিয়া সব নোট করিয়া লইলেন।

বসিয়ে-দেওয়া।

ট্রামে খুবই ভীড় হইয়াছিল—একটী মোটা বাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন—দরজার পাশেই একটী খুব রোগা ফিট্‌ফিটে ফুলবাবু বসে ছিলেন—তিনি একটু সরে বল্লেন—বসুন না মশাই কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন—ভদ্রতা রক্ষার্থে মোটা বাবুটী বল্লেন—"না-না আপনি বসুন আমি বেশ আছি।" ফুলবাবুটী নাছোড় বান্দা—নিজে উঠে—নিজের জায়গায়

তাঁকে বসিয়ে দিলেন ও একটু পরেই নেমে গেলেন। মোটা বাবুটী বসিয়া একটু সুস্থ হইবার পর পকেটে হাত দিয়া—"এঁ্যা আমার নোটের তাড়া বলিয়া"—চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ব্যাপারটা সকলেই বুঝিতে পারিলেন—ও তাঁহাকে সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন—একটী ডেঁপো ছেলে কোণে দাঁড়িয়েছিল—সে বল্লে "সে বাবুটী সত্যি সত্যিই ওঁকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।"

ফলিত জ্যোতিষ।

মুণ্ডিত শ্মশ্রুগুম্ফ—বিপুল শিখাশোভিত চন্দন-চর্চ্চিত বপু জ্যোতিষী মহাশয় গরদের ধুতি পরিধান করিয়া শিল্কের চাদর গায়ে দিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে শীকারের জন্য জাল পাতিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় উড়িয়া ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"সাব আসিছু"। নেত্রোন্মিলীত করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন—যা একটা চেয়ার এখানে এনে দে। চেয়ারও আসিল, সাহেবও আসিলেন—আগন্তুক একজন নামজাদা সাহেব ব্যারিষ্টার, চতুর জ্যোতিষী একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াই আবার চক্ষুমুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ধন সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিচার—এই বলিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন—কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা—আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন দেখুন ওসব আবশ্যক নেই—ব্যবসার অনেক রকম Tricks. থাকে তা যাক্ আমার স্ত্রী মিসেস রায়চৌধুরী একটু পরেই আপনার কাছে হাত দেখাতে আসবেন সেই সময় অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে বল্‌বেন যে মোটর চাপা দিয়া মানুষ মারিয়া ফাঁসি যাইবার একটা মত ফাঁড়া তার আছে, তবে তিনি যদি কখন মোটর না কেনেন তবে সেটা কেটে যেতে পারে। জ্যোতিষী মহাশয় নোটটী ট্যাঁকস্থ করিয়া বলিলেন, "পাঁচ টাকায় পাঁচ হাজার টাকা বাঁচাবার জন্য এই tip।"

ভালবাসার স্তর।

স্ত্রী (স্বামীর প্রতি) হাগা তুমি যে প্রায়ই বল সতীশবাবু তার স্ত্রীকে ভয়ানক ভালবাসেন—তাকে মিল্লে আজ ১৫ দিন বাড়ী ছাড়া, তা বৌটাকে একখানা চিঠিতো লেখেই নি, এমন কি কিছু খরচ পত্র পর্য্যন্ত ও দিয়ে যায় নি—বেচারা কি খেয়ে বাঁচে বল দেখি এ আবার কি রকম ভালবাসা জানিনে বাবু—

স্বামী (সহাস্যে) একে বলে নিষ্কাম প্রেম—প্রেমের শুদ্ধ উচ্চস্তর।

স্ত্রী—তাহলে আমাদের নীচের স্তরে থাকবারই ব্যবস্থা করো।

নারীদের কর্ত্তব্য।

নারীজাগরণী সভার সভাপতিনী (পত্নী বলিলে একজন পতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহা ব্যবহৃত হইল না) উচ্চকণ্ঠে কহিলেন "কুমারীগণ! জাগো, নারীমর্য্যাদারক্ষার্থ বদ্ধপরিকর

হও—পুরুষদের স্বার্থপরতা ও অহেতুক কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান কর—কেহ আর বিবাহ করিও না এবং নিজেদের কন্যাদেরও বিবাহ দিও না— পুরুষদের দর্প চূর্ণ কর—"

একজন কুমারী অপরার কাণে কাণে কহিল "আমরাই যদি বিবাহ না করি তবে আমাদের কন্যা আসিবে কোথা হইতে, যে তাহাদেরও বিবাহ দিব না।"

বয়স নির্ণয়।

তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী—হাঁ ঝি, তোদের বাবুর বয়স কত হবে?

ঝি—আজ্ঞে তাঁর সাক্ষাতে আমরা বলি পঁয়ত্রিশ, আর আড়ালে বলি পঁয়ষট্টি—আর আপনার সামনে বল্‌তে বলে দিয়েছেন পঁচিশ।

নীলার আংটি।

স্ত্রী—ব্যস্ত হইয়া আসিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"ওগো, শীগ্‌গির একটা ডুবুরী ডাক্‌তে পাঠাও—কাল যে নীলার আংটীটা এনে দিয়েছিলে—নাইতে গিয়ে সেটা পুকুরে পড়ে গেছে—

স্বামী—বলিলেন, আচ্ছা ভেবে দেখি। খানিক পরে স্ত্রী আসিয়া আবার তাগাদা করাতে স্বামী বলিলেন—ভেবে দেখ্‌লুম ডুবুরী এনে কাজ নেই—সে এলে একটা টাকার কম জলে নামবে না—তার চেয়ে আট আনা দিয়ে আবার একটা ঐ রকম নূতন আংটীই এনে দেব—

স্ত্রী—(বিস্মিতভাবে) কি সর্ব্বনাশ! তবে কি সেটা গিল্‌টীর নাকি—

স্বা—প্রেয়সী! পৃথিবীটাই যে গিল্‌টী করা।

স্ত্রী চরিত্রের বিকাশ।

প্র—স্ত্রীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ কখন দেখিতে পাওয়া যায়?

উঃ—যখন তিনি কাহারও সহিত কলহে নিযুক্তা থাকেন; নতুবা যে জিহ্বা সাধারণে মধু বর্ষণ করে কলহকালীন তাহা হইতে উদ্গীরিত বিষের তীব্রতা ঠিক অনুভব করা যায় না।

হিসাবী লোক।

পথে যাইতে যাইতে রামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় শ্যামচরণ বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার কাছে আমার কিছু ধারটার নেইতো?" রামবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "না—আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে বলেতো মনে পড়ে না—কেন আপনি এখন দেনা শোধ কর্ত্তে বেরিয়েছেন নাকি?" হাসিয়া শ্যামবাবু বল্‌লেন—"না না—না দেনা আমি কখন শোধ করি না—তবে দেখ্‌ছি এখনও কার কার কাছে দেনা করা হয় নাই অর্থাৎ কারো কাছে যেন অঋণী না থাকি—" রামবাবু ততক্ষণে পাশ কাটাইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আগামী (অষ্টম) বর্ষের

নিরুপমা=বর্ষস্মৃতি

আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল, আরও সুসম্পন্ন হইবে।

চিত্র-সৌন্দর্য্য—ভারতের নবীন চিত্রশিল্পীগণের চিত্র প্রকাশার্থ গ্রহণ করা হইবে। অমনোনীত চিত্রাদি রেজেষ্টারী ডাকযোগে প্রত্যর্পিত হইবে। গ্রহণার্থ চিত্র পাঠাইবার শেষ তারিখ এই বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তির দিন। বর্ণচিত্র, রেখাচিত্র, আলোকচিত্র প্রভৃতি সকল শ্রেণীর চিত্র গৃহীত হইবে—চিত্রাদি রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

রচনা-সম্পদ—বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাবান লেখকগণের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ব্যঙ্গ-কণিকা প্রভৃতি তো থাকিবেই অধিকন্তু নবীন রচয়িতাগণের রচনা ও প্রকাশার্থ বিবেচনা করা হইবে। রচনা অমনোনীত হইলে প্রত্যর্পিত হইবে না—নকল রাখিয়া, রেজেষ্টারী ডাকযোগে পাঠাইবেন। অমনোনীত হইলে তজ্জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া বা গ্রহণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পত্র ব্যবহার সম্ভব হইবে না। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ, এই বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তির দিন।

মুদ্রণ-সৌষ্ঠব—উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা যে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের বিশেষত্ব—তাহা বিগত সাত বর্ষে দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই

প্রকাশের তারিখ—সাধারণের অনুরোধে আগামী বৎসরের পুস্তক একটু সময় থাকিতেই প্রকাশিত হইবে, অন্ততঃ পূজার একমাস পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিব তবে এ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না কারণ সকল বিষয় আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। [illegible] পুস্তক প্রকাশের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইবে এবং ঠিক সময়েই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য—এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ইহা সকলেই অবগত আছেন; মাত্র মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় লইয়া ইহা প্রচার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মূল্যাদির বিষয় পরে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

বিনামূল্যে দিবার ব্যবস্থা—আমাদের প্রচারিত "হিমানী" স্নো, 'নিরুপমা' তৈল "ভেলভেট হেয়ার ক্রীম" ও "কুমকুম এসেন্স ব্যবহারকারীগণকে ঐ সকল জিনিসের সহিত প্রদত্ত [illegible] কুপনের পরিবর্ত্তে ইহা প্রদান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে স্থানে আমাদের সন্দেহ হইবে যে প্রেরক আমাদের প্রচারিত দ্রব্যাদির ব্যবহারকারী নহে সেস্থানে আমরা বিনামূল্যে এই বহি দিব না এবং তজ্জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে না। গ্রাহকগণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাহারা যেন উল্লিখিত দ্রব্যাদি ক্রয়কালীন কুপন দেখিয়া লয়েন। আগামী বৎসরের জন্য কুপন ১লা নভেম্বর হইতে যে সমস্ত দ্রব্য প্যাক হইবে তাহার সঙ্গে থাকিবে।

নিবেদক—শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

পুঃ—আবশ্যক হইলে যে কোন সময়ে এই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা আমাদের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং